উষার আলো

স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ

আষাঢ়
১৩৩৭

প্রবাসী কার্য্যালয়
১২০-২ অপার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীরেবতীমোহন বর্ম্মন, এম-এ
২৩-১, ই, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

দাম এক টাকা

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
প্রিণ্টার—সুরেশচন্দ্র মজুমদার
৭১।১ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৪৭।৩৮

ঊষার আলো

পরিচয়

উপন্যাসের পরিচয় লেখক নিজে দিলে তাতে ভাল-মন্দ দুই হতে পারে। ভাল হতে পারে এই জন্যে—যে-চরিত্র যে-ভাবে এঁকেছেন, তা তিনি যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে দেখাতে পারেন, অন্যের পক্ষে তেমন সম্ভব নয়; আর মন্দ এই হিসেবে—তাতে পাঠক-পাঠিকার নিজস্ব বিচার-বুদ্ধিকে খর্ব্ব করা হয়। শেষ দোষ যাতে না আসে অর্থাৎ পাঠকের বিচার-শক্তিকে ক্ষুণ্ণ হতে না দিয়ে, উপন্যাসের কয়েকটি মূল চরিত্রের সঙ্গে আমি দুচার কথায় সকলের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই।

মূল চরিত্র উপন্যাসে চারটি—সুব্রত, চিরব্রত, রেণু আর দয়া। সুব্রত 'মানব-সমিতি'র নেতা, চিরব্রত তাঁর ভাই। সুব্রতর হৃদয়ে মমতা ও নির্ম্মমতা সমান ভাবে ঠাঁই পেয়েছে। মানব-প্রেম ও অত্যাচারীকে শাসন করবার সঙ্কল্প তাঁর মনে সংগ্রাম বাধিয়েছে, সময়ে সময়ে তাঁকে পাগল করেছে,—কাঁদিয়েছে। মেয়েদের নিয়ে তিনি খেলেছেন, তবুও মনে তাঁর কখনো কামনা জাগেনি, শুধু তাই নয়—তিনি এমন ভাবে মিশেছেন যে, তাদের অন্তরেও কোনদিন তার ছায়া পড়েনি, মানুষ যে-বৃত্তির পদানত, সুব্রত তাকে তালি দিয়ে নাচিয়েছেন।

চিরব্রতের জীবন দাদার মত না হলেও নিজ সীমার মধ্যে সাবলীল; সুব্রতর শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের আব্‌ছায়ায় তা ম্লান হয়ে যায়নি। সুব্রত হিসেবী—চিরব্রত খেয়ালী, কিন্তু তার খেয়ালের ভেতর ছন্দ আছে, একেবারে বেতালা নয়।

রেণুর অন্তর ভগবতমুখী, বাহির কর্ম্মচঞ্চল। সে ফুলের মত পবিত্র, জলের মত নির্ম্মল, হাওয়ার মত স্বাধীন, আকাশের মত উদার। তার হৃদয় সাগরের মত, সেখানে তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত আছে। সে যেমন সরল তেমনি চতুর, যেমন লাজুক তেমনি সাহসী। তার মুক্ত আত্মা স্বেচ্ছায় বন্ধনকে বরণ কর্‌তে চায়।

তার পর দয়া। ঠিক রেণুর মত না হলেও সে তার চাইতে কম নয়। নিজ জীবনের সুখ সে বোঝে না, সে বোঝে জাতির আনন্দ; স্বদেশ-প্রেম—স্বামি-প্রেমকে অবহেলা না করে, অগ্রাহ্য ও অশ্রদ্ধা না করেও তাকে ভাসিয়ে নে' যেতে চায়।

—ইতি

কলিকাতা,
১লা আষাঢ়, ১৩৩৭

শ্রীচন্দ্রেশ্বরানন্দ

নিবেদন

গ্রন্থকার, উপন্যাসের কয়েকটি অধ্যায় 'কথা কও, কথা কও' এই গল্পাকারে ও 'শ্রীকমলকিশোর মুখোপাধ্যায়' এই ছদ্ম নামে— 'উদ্বোধনে' বের করেছিলেন। তখনকার অংশ, এখন সম্পূর্ণ হয়ে প্রকাশিত হোল।

বিনীত
প্রকাশক

উষার আলো

প্রথম পরিচ্ছেদ

সে দিন দোল। জীম্‌নাসিয়াম্ গ্রাউণ্ডে ছেলে-মেয়েদের খুব রংয়ের খেলা, আর পার্ব্বণীর পয়সায় খাবারেরও ধুম। খুব হুল্লোড় চলেছে। আরে—রেণু কোথায় গেল? খোঁজ—খোঁজ। দেখা গেল, পাশের বাড়ীর ভাঙ্গা পাঁচিলের আড়ালে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কাঁদছে। কমল কাছে গিয়ে জিগেস্ করলে, "কি হয়েছে রেণু?"—উত্তর নেই। উদ্‌গ্রীব হয়ে সব ছেলে-মেয়ে তাকে ঘিরে, কেবল শম্ভু একটু তফাতে লজ্জায় নত হয়ে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ রেণু লাফিয়ে উঠে, ঘাড় বেঁকিয়ে, তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করে বলে উঠলো, "দেখ্‌বি শম্ভু, তোর কি করি দেখ্‌বি।" রাগে তার বড় বড় চোক পদ্ম-দলের মত লাল হয়ে উঠেছে, কাল মণিদুটো ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে, দীর্ঘ নাতিবক্র নাসিকা তার স্ফীত, কুঞ্চিত কেশদামে সমস্ত পিঠ ভেসে গিয়েছে, তন্বী শরীর তার থর্ থর্ করে কাঁপছে। বাহার এসে তার হাঁত ধরে টানতে টানতে বল্‌লে, "বুঝেছি, চল্ কাল দেখা যাবে।" যেতে যেতে

রেণু মুখ ফিরিয়ে বলে গেল, "কমলদা, কাল সকালে আমাদের বাড়ী একবার এসো।"

বিকেলে কমল শম্ভুকে নিয়ে বেড়াতে গেল। যখন তারা প্রিন্সেপ ঘাটের কাছাকাছি গিয়েছে, তখন দেখা গেল, একখানা ফীটন গাড়ীতে রেণু আর বাহার তীরবেগে ছুটে আসছে। যেই শম্ভুর কাছে আসা, অমনি রেণু এক গাছা বেতের ছড়ি দিয়ে শম্ভুকে ছপাছপ বসাতে লাগল। কি জানি কেন, শম্ভু নীরবে দাঁড়িয়ে তার মারগুলো হজম কর্ছিল।

—এমনি করে খেলাধূলো ঝগড়াঝাটির ভেতর দিয়ে এই কিশোরের দল যখন তরুণের সীমায় পা দিয়েছে তখন স্বদেশী যুগ, সারা বাংলায় স্বদেশ-প্রেমের বন্যা ছুটেছে।

একদিন সন্ধ্যার পর কমল পড়তে বসেছিল। খানিক পরেই বাহার খুব আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে দোর বন্ধ করে দিলে। তাকে দেখেই কমল আনন্দে লাফিয়ে উঠে জিগেস্ করলে, "কিরে, কিছু পেলি ?"

চাপা গলায় বাহার উত্তর দিলে, "চুপ্—"

এবার খুবই চুপি চুপি কমল বল্লে, "বের কর্ শীগ্‌গীর—দেখি।"

বাহার হেসে উত্তর করলে, "যা ভেবেছিস্ তা নয়। তোকে একটা কথা বলতে এসেছি।"

উষার আলো

"কি ?"—বলে কমল উদগ্রীব হয়ে উত্তরের অপেক্ষায় বাহারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বাহার জিগেস্ করলে, "মানুষের অত্যাচার সহ্য করতে পারবি ?"

'কোস্‌চেন্' জানবার আশা থেকে অত্যাচারে কথায় কমল একটু থতমত খেয়ে গেল ; তবুও ঘাড় বেঁকিয়ে বল্‌লে, "পারবো।"

"বাঃ, এই তো চাই"—বলে বাহার জামার ভেতরের পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে কমলকে পড়তে দিলে। কাগজখানা খুলে সে দেখলে, তার ওপর বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে 'উষার আলো।' নাম দেখেই কমলের মন আনন্দে নেচে উঠল। অনেকদিন আগে এই রকমের একখানা লিফ্‌লেট্ কলেজের নোটিস বোর্ডে আঁটা ছিল ; তার শেষের কথাগুলো এখনও কমলের মনে আছে,—"হে জাগ্রতের দল! তোমরা ঘরে ঘরে তৈরী হয়ে থাক, সময় হলেই আমরা ডেকে নেব।" সেইদিন থেকে কমল এদের সম্বন্ধে কত কথাই না ভেবেছে, কত কল্পনাই না করেছে! বাহার সেই অদ্ভুতকর্ম্মা দলেরই একজন!—এই মনে করে কমল অবাক হয়ে গেল। যে-বাহার তাদের মতই কলেজ যায়, আড্ডা দেয়, সেই আবার এত বড় একটা ব্যাপারে জড়িত! কমল, বাহারের হাত চেপে ধরে বল্‌লে, "ভাই, আমাকেও তোদের দলে নিতে হবে।"

মুচকি হেসে বাহার উত্তর দিলে, "সেই জন্যেই তো এসেছি। কিন্তু দেখিস্, কিছুতেই এ সব কথা কারুকে বলিস্নি। খুব হুঁসিয়ার হয়ে সকলের সঙ্গে কথা কইবি, যেন বেফাঁস্ কোন কথা বেরিয়ে না পড়ে। * * আমি যা বল্‌বো তাই শুনবি তো ?"

কমল আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লে, "তুই ?"

"হ্যাঁ আমি। শুধু আমি নই, আমাদের লীডার যার মারফতেই আদেশ পাঠাবেন, সে তাঁরই হুকুম বলে মানতে হবে।"

"তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না ?"

"এখন না। যখন তিনি ভাল বুঝবেন তখন নিজেই এসে দেখা করবেন। এখন বল্—তাঁর সব কথা মানতে পারবি কি-না ?"

"পারবো।"

"ঠিক্ তো ?"

"ঠিক্।"

"যদি না পারিস্ তা হলে কিন্তু ভাই, ভারি মুস্কিল হবে।"

"পারবো, পারবো, নিশ্চয় পারবো—দেখে নিস্।"

বাহার খুসী হয়ে মুরুব্বীর মত কমলের পিঠ চাপড়ে বল্‌লে, "বহুৎ আচ্ছা!—আজ ভাই তবে আসি।"

কমল জিগেস্ করলে, “কি করতে হবে আমায় ?”

“পরে জান্‌বি”—এই বলে বাহার চলে গেল।

*　　　*

কমল আর রেণুদের বাড়ী পাশাপাশি। কমলের বদ্ অভ্যাস ছিল—রেণুকে কোন কথা না বলে সে থাকতে পারতো না। কোন্ দিন ‘ষ্ট্রাইক্’ করে প্রফেসরকে জব্দ করেছে, শীল্ড ম্যাচে মোহনবাগানের কোন্ খেলুড়ে কি রকম খেলেছে,—সব কথা রেণুকে তার বলা চাই। আর আজকের এত বড় একটা ব্যাপার তাকে না বলে সে কি থাকতে পারে ? রেণুদের বাড়ীর সামনে এসে কমল একবার কি ভাবলে, তারপর পিছনের দোর দিয়ে তাদের বাড়ী ঢুকলো।

রেণু তখন তার খরগোষটাকে আদর করছিল। কমল ডাকলে, “রেণু, শোন্।”

সে তার কাছে এসে জিগেস্ করলে, “কি কমলদা ?”

“তোর ঘরে চল্”—এই বলে কমল পাশের ঘরে এসে, ‘উষার আলো’ লিফ্‌লেট্‌খানা তার সামনে ধরলে।

রেণু বিস্মিত হয়ে জিগেস্ করলে, “এ কোথায় পেলে ?”

কমল গম্ভীর হয়ে বল্‌লে, “তা বলবো না।”

“বারে মজা,—বলবে না কেন ?”

“আমরা যাকে তাকে বলি না।”

"ওমা, তুমি বুঝি ওদের দলে মিশেছ ?"

"কেন মিশব না ?"

রেণু হেসে বল্লে, "আচ্ছা কমলদা, আমায় নিতে পার ?"

সে উত্তর কর্‌লে, "তুই যে মেয়েছেলে, তোকে কি নেওয়া চলে ?"

"বারে, মেয়েছেলে তো হয়েছে কি ?"

"আচ্ছা, দেখা যাবে'খন"—এই বলে কাগজখানা রেণুর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে, কমল তাড়াতাড়ি চলে এল।

* *

দেশের কাজ করবো—এই রকম একটা ভাব কমল মনে মনে পোষণ করতো।

কাজের ডাক্ রেণুর কাণে খুব জোরে এসে না বাজলেও, আর একজনের ইঙ্গিত তার কাছে দিন দিন যেন স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ছিল। সে—কে ? কোন্ নক্ষত্র-লোক হতে তার কথা ভেসে এসে, বুকের চেতনাকে ধীরে ধীরে জাগিয়ে, আবার কোথায় মিলিয়ে যায়, তা বুঝতে না পারলেও রেণুর মনে হোত—এই অশরীরীর অনির্দ্দিষ্ট ডাকে সাড়া না দিলে তার জীবনের সুর চিরদিন বেসুর হয়েই বাজবে। মীরাবাই-এর জীবনী সে পড়েছিল। মীরার অতুল ঐশ্বর্য্যের তলে তলে ত্যাগের যে অগ্ন্যুদ্গম তিল তিল করে জমে, একদিনের বিস্ফুরণে

রাজরাণীর ভোগায়তনকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে, সেই শ্মশান-ভস্মের ওপরেই সন্ন্যাসিনীর অবিনশ্বর ভাগবত জীবন গড়ে তুলেছিল, সেই আগুনের লেলিহান জিহ্বায় তার জীবনকেও পুড়িয়ে খাঁটি করে নেবার দুর্ব্বাসনা রেণুর কোমল স্নিগ্ধ শান্ত জীবনকে সময় সময় বড়ই উতলা করতো। সেদিন যদিও বিদ্রূপ-ছলে কমলকে সে বলেছিল, 'আমায় তোমাদের দলে নেবে ?' কিন্তু, যথার্থই তার মনে হয়েছিল—যারা দেশের সেবা করবার জন্যে নিজের সব সুখ অনায়াসে বিসর্জ্জন দিতে পারে তারা ভগবানের প্রিয়, তাদের মত হলে সেও নিজের জীবন সফল করতে পারবে। তাই, এই খেয়ালীদের দলে নাম লিখিয়ে ধন্য হবার জন্যে আজ সত্যই তার মনে এত ব্যাকুলতা! কমলকে সে ঠিক নিজের ভায়ের মতই দেখতো; কিন্তু যেদিন জানলে সেই আপন-ভোলাদের দলে গিয়ে সে মিশেছে, সেইদিন থেকে অতল সহোদরা-স্নেহ নিশিদিন তার দুরন্ত ভাইটির পিছু পিছু ছুটতো।

রেণু, কমলকে সহজে ছাড়লে না; কয়েকদিন পরে সে তাকে আবার বল্‌লে, "ভাই, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমায় তোমাদের দলে নাও!"

কমলের কিন্তু সেই একই উত্তর, "তা কি হয় রে, তুই যে মেয়েছেলে। এ সব কাজ কি তুই পারবি ?"

"খুব পারবো—দেখে নিয়ো।"

"আচ্ছা—" বলে কমল চলে যাচ্ছিল। রেণু তার পথরোধ করে দাঁড়িয়ে, হেসে বল্‌লে, "তা হবে না ভাই, ফাঁকি দিলে চল্‌বে না, আগে বলে যাও কবে নেবে, তবে ছাড়বো।"

কমল এবারে মুস্কিলে পড়ে বল্‌লে, "আমাদের লীডারকে জিগেস্ করে, তারপর তোকে বলবো।" মনে মনে ভাবলে—রেণুকে বলে ভাল হয়নি।

রেণু তাকে ভয় দেখিয়ে বল্‌লে, "আচ্ছা দেখবো, যদি আমায় ভাঁওতা দাও, আমি মাসীমাকে সব বলে দেব"—এই বলে একমুখ হেসে সে কমলকে পথ ছেড়ে দিলে।

যেতে যেতে কমল বল্‌লে, "দাও না বলে—মজাটি দেখবে তখন।"

রেণুকে শাসিয়ে গেলেও তার মন বড়ই শঙ্কিত হয়ে উঠলো। সে ভাবলে, রেণু যা-মেয়ে—কোন রকমে তাকে ঠাণ্ডা না করলে সে সব কথা হয় তো মাকে বলে দেবে। তা হলেই হয়েছে আর কি! পরের দিন কমল বাহারকে গিয়ে বল্‌লে, "ভাই, রেণুও আমাদের দলে আসতে চায়।"

বাহার উত্তর দিলে, "আচ্ছা—আমি তোকে পরে জানাব।" দু-তিনদিন পরে সে কমলকে বল্‌লে, "আমাদের লীডার আজ সন্ধ্যার পর তোদের বাড়ী গিয়ে রেণুর সঙ্গে দেখা করবেন।"

উষার আলো

তখন রাত্রি আটটা। একজন ভদ্রলোক কমলদের বাড়ী এসে তার খোঁজ করলেন। কমল আগের থেকেই রেণুকে বলে রেখেছিল। ভদ্রলোককে নিজের পড়বার ঘরে বসিয়ে, সে তাকে ডাকতে গেল। রেণু ভেবেছিল, তিনি পাকা দাড়ীওয়ালা কোনও আচার্য্য প্যাটার্ণের লোক হবেন, তাই সে কোনরূপ সঙ্কোচ অনুভব না করে, খুব সহজ ভাবেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এল। কিন্তু এসে, কমলের ঘরে ঢুকেই সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। সুশ্রী চেহারা, গোঁপ দাড়া কামান, দামী র‍্যাপার গায়ে সাতাশ আটাশ বছরের একটি ছেলে চেয়ারের ওপর চুপ করে বসে আছেন। বিশেষত্বের মধ্যে—চুল ছোট করে ছাঁটা, চোখ দুটি নিস্তরঙ্গ হ্রদের মত শান্ত, আর মসৃণ ললাটে চিন্তার দু-একটি রেখা। এই সম্পূর্ণ অপরিচিত ছেলের সঙ্গে বসে আলাপ করা নিতান্ত অশোভন ভেবে রেণু তাড়াতাড়ি সরে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় তিনি হেসে বল্‌লেন, "এস দিদি, লজ্জা কি?" সেই ডাকের এমন একটা মোহিনীশক্তি যে, তার সমস্ত লজ্জা একটা নির্ম্মল শ্রদ্ধায় ঢাকা পড়ে গেল। রেণু এগিয়ে এসে টেবিলের গায়ে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়াল। ভদ্রলোকটি জিগেস্ করলেন, "কমল কোথায়? তাকেও ডাক না।"

সে দোরের পাশেই দাঁড়িয়েছিল, ডাকতে হোল না, নিজেই

এল। তাকে দেখে তিনি বল্‌লেন, "তোমার বোনের নাম কি, কমল ?"

কমল উত্তর দিলে, "রেণু।"

ভদ্রলোক হেসে বল্‌লেন, "আমার নাম কি জান ?—সুব্রত। তবে আমায় সকলেই 'দাদা' বলে ডাকে।" তারপর খানিক চুপ করে বল্‌লেন, "কিন্তু এ দুর্ব্বুদ্ধি তোমার বোনের মাথায় গজালো কেন বল তো ? বাঙ্গালীর মেয়ে—কোথায় ছেলেপুলে নিয়ে সুখে থাকবে, তা না—যত সব বাজে খেয়াল ! না রেণু, এ সব পাগলামী করো না।"

রেণু কুণ্ঠিত হয়ে, মাটীর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

তিনি বল্‌লেন, "কি, চুপ করে রইলে যে ?"

এবার সাহসে ভর করে রেণু উত্তর দিলে, "কেন ? আমাদের কি ওছাড়া আর গতি নেই ?"

"তা কি আমি বোলছি ? তবে—" একটু থেমে বল্‌লেন, "তুমি পারবে কি ?"

"কেন পারবো না ?"

সুব্রত একমুখ হেসে বল্‌লেন, "তার প্রমাণ ?"

রেণু ভাবলে ঠিকই তো ! সে যে-কাজ করতে চাইছে তা যে সত্য সত্যই পারবে তার নিশ্চয়তা কি ? কিন্তু মনের ভাব যথা সম্ভব গোপন করে বল্‌লে, "কি প্রমাণ আপনি চান ?"

"বেশী না, অতি সামান্য"—তারপর একতাড়া লিফ্‌লেট্ বের করে তিনি বল্‌লেন, "ব্যাটাছেলে সেজে, হেদোয় গিয়ে এখনি এগুলো বিলি করে আসতে হবে।"

এই সামান্য কথাটা—রেণুর কাছে বড়ই ভয়ানক! তা কি করে হবে? ব্যাটাছেলে সেজে সে যাবে কেমন করে? কেউ যদি চিনতে পারে? কিন্তু এতদূর এসে, শেষে পিছিয়ে পড়লে কমলই বা কি ভাববে? ইনিই বা কি মনে করবেন? এই সব ভেবে 'হ্যাঁ' বা 'না' কিছুই তার বলা হোল না।

তাকে নিরুত্তর দেখে সুব্রত বল্‌লেন, "তা হলে আমি আসি, সখ মিটেছে তো?"

রেণু এবার তাঁর মুখের দিকে চোখ তুলে চেয়ে বল্‌লে, "আচ্ছা দিন, কিন্তু পুরুষের পোষাক পাব কোথায়?" খুব হাল্কা করে বলতে চেষ্টা করলেও তার গলার স্বর জড়িয়ে আসছিল। কমল উৎসাহের সঙ্গে বল্‌লে, "কেন, আমার জামা কাপড় পরে যা না। আর, শিল্কের চাদরটা মাথায় পাগড়ীর মত জড়িয়ে নে, তা হলে কেউ চিনতে পারবে না।"

রেণু পাশের ঘরে চলে গেল। মিনিট কুড়ি পরে সে যখন বেরিয়ে এল, তখন তার পরণে সুন্দর কোঁচান ধুতি, গায়ে ভায়লা সার্ট, মাথায় পাগড়ী। নিজের বেশভূষা দেখে সে নিজেই মুখ টিপে টিপে হাসছিল। কমল অবাক হয়ে বল্‌লে, "আরে, আমিই

যে তোকে চিনতে পারছি নে!" তার কথা শেষ হতে না হতে রেণুর মাথার পাগড়ী ভুস্ করে খুলে গিয়ে রাশিকৃত চুল পিঠের ওপর ছড়িয়ে পড়লো। "এই যাঃ"—বলে রেণু ছেলেমানুষের মত হেসে উঠলো। তার দুরবস্থা দেখে সুব্রতও হাসি আর চেপে রাখতে পারলেন না। কমল তাড়াতাড়ি চাদরটা তুলে নিয়ে রেণুর মাথায় বেশ করে এঁটে বেঁধে দিলে। রেণু আয়নার কাছে গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে পাগড়ীটা ভাল করে পরীক্ষা করে বল্‌লে, "নাঃ, এ আর খুলছে না!"

তারপর যা করতে হবে রেণুর পক্ষে তা তো খুবই অভিনব, কিন্তু এত সাজগোজ করে আর পিছিয়ে পড়া ত চলে না!

সুব্রতর দিকে তাকিয়ে সে জোর করে হেসে বল্‌লে, "কৈ— দিন্।" তারপর লিফ্‌লেটের তাড়াটা বগলের ভেতর নিয়ে সে চলে গেল।

কয়েক মিনিট পরেই সুব্রত বল্‌লেন, "তুমি বোস কমল, আমি এক্ষুণি আসছি,"—এই বলে একটা সিগারেট ধরিয়ে সেটা টানতে টানতে তিনিও বেরিয়ে গেলেন।

প্রায় আধঘণ্টা পরে সুব্রত ফিরে এলেন। এই আধঘণ্টা কমলের যে কি করে কেটেছে তা সেই জানে। কাল্পনিক নানা বিপদের ভয় এই সামান্য সময়কে অতি দীর্ঘ করে, পলে পলে

তাকে কতই না অসহ্য যন্ত্রণা দিয়েছে। সুব্রত ফিরে এলে, সে সভয়ে জিগেস্ কর্‌লে, "রেণু—রেণু কোথায় ?"

তিনি হেসে বল্‌লেন, "ভয় নেই—আসছে।"

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাড়ে দশটা বেজেছে। শীতের রাত্রিকে আচ্ছন্ন করে কুয়াসায় সমস্ত সহর অবগুণ্ঠিত। আকাশে মেঘ জমেছে, মাঝে মাঝে দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি মাটীর বুকে এসে পড়ছে। উত্তুরে বাতাসে তরঙ্গায়িত জল কল্ কল্ করে নৌকোর তলে তলে ছুটছে। একখানা 'জলিবোট্' থেকে একটি ছেলে নেমে এসে, সামনের বাড়ীতে গিয়ে খোঁজ নিলে—ডাক্তার ধীরেশ বাবু কি 'কল্' থেকে ফিরেছেন ?

তিনি বাড়ী আছেন শুনে ছেলেটি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাইলে।

ধীরেশ বাইরে এসে জিগেস্ করলেন, "কে আপনি, কি চান ?"

ছেলেটি কোন কথা না বলে একখানা চিঠি তাঁর হাতে দিলে।

চিঠিখানা পড়ে তিনি ছেলেটিকে বল্লেন, "বসুন, আমি এক্ষুণি আসছি।" তারপর ভেতরে গিয়ে একটা ওভার-কোটে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে তক্ষুণি বাইরে এলেন।

জোয়ারের মুখে বোট্ তর্ তর্ ভেসে চল্লো। এপারে ওপারে,

ঊষার আলো

গঙ্গার তীরে তীরে অসংখ্য আলোকমালা ঝল্ মল্ করছে। ছিন্ন-ভিন্ন মেঘের ফাঁকে ফাঁকে শিশু-শশীর কচি হাসি নর-নারীর নয়ন ভোলাচ্ছে। বোটের ভেতর একটা কেরোসিনের বাতি টিম্ টিম্ করে জ্বলছে, তার ক্ষীণ আলোকে যতদূর দেখা যায় তাতে ডাক্তারের মনে হোল, দাঁড়ি-মাঝির কারো বয়স একুশ বাইশের বেশী নয়। সব চুপ্‌চাপ্, কারুর মুখে কথাটি নেই। তবু্ও কত কথাই না তাঁর মনে হচ্ছিল,—কি হয়েছে, কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি? প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে পাড়ি দিয়ে বোট্ এপারে এল ছেলেরা নেমে এসে ডাক্তারকে নিয়ে একটি সরু রাস্তা ধরে চল্‌লো। পথে আলো নেই। দুধারের গাছ পাতার ভেতর অন্ধকার ভীষণ হয়ে উঠেছে। কোথাও বাঁশগাছ নত হয়ে পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। মাটী ভিজে। অসংখ্য নিশাচরের সচকিত বিচরণ রাত্রির নীরবতাকে স্পষ্ট করে তুলেছে। মিনিট পনের এই রকম পথ চলার পর তাঁরা একটি প্রকাণ্ড পরিত্যক্ত বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালেন। ধীরে ধীরে ঘা দিতে ভেতর থেকে দোর খুলে গেল। পদশব্দে ডাক্তার বুঝলেন, বাড়ীতে মানুষ আছে, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। ছেলেরা একটি ঘরের ভেতর তাঁকে নিয়ে এল। ঢুকেই তিনি দেখলেন, কম্বল বিছিয়ে সুব্রত বসে আছেন।

ধীরেশকে দেখেই তিনি বলে উঠলেন, "এস ভাই বস, খুব কষ্ট হয়েছে—না ?"

ধীরেশ বল্‌লেন, "কষ্ট আর কি ? তবে ব্যাপার কি বল তো ? এত রাত্তিরে, এ হেন জায়গায় যে ডেকে আনলে ?"

সুব্রত হেসে উত্তর করলেন, "এরা ভারি সুন্দর মাংস রান্না করেছে ; ভাবলুম, একা একাই খাব ?—কিছু খেয়ে এসনি তো ?"

"খাবার আর সময় পেলুম কখন ? কিন্তু বেড়ে লোক তো তুমি ? একবাটি মাংসের জন্যে শীতকালের রাত্তিরে এই দুর্ভোগ ভোগালে ?"

সুব্রত যেন আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লেন, "সেকি হে, একবাটি মাংসের জন্যে আমি যে দশ কোশ পথ হেঁটে যেতে পারি !"

ধীরেশ হো হো করে হেসে উঠলেন। "তা তুমি পার ভাই, তোমার অসাধ্য কিছু নেই"—এই বলে তিনি সুব্রতর ছেঁড়া কম্বলের ওপর বসলেন।

সুব্রত, বাহারকে ডেকে বল্‌লেন, "খাবারটা নিয়ে এস তো ?"

বাহার এ্যানামেলের দুটো থালায় মাংস আর কয়েকখানা টোষ্ট নিয়ে এল। ফাউল-কারীর গন্ধে তখন ঘর ভরে গিয়েছে। ধীরেশ ঢোক গিলে বল্‌লেন, "দাদা, তুমি চিরকাল বেঁচে থাক। ক্ষিদের মুখে এই চিজ্ !"

বাহার চলে গেলে তিনি সুব্রতকে জিগেস্ করলেন, "কিন্তু, কেন যে ডেকে আনালে তা তো কিছুই ভাঙ্গলে না।"

"হবে হবে, আগে খেয়ে নাও"—এই বলে তিনি নিজের থালা থেকে দু-এক টুকরো মাংস ধীরেশের পাতে তুলে দিলেন।

"আরে, কর কি ?"

"কিছু না, ও গোষ্পদ তুল্য, চলে যাবে'খন।"

খাবার সময় ডাক্তারের কানে এল—পাশের ঘরে কে যেন রোগযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে। তাঁর মন খুব উদ্বিগ্ন হলেও কিছু জিগেস্ করলেন না। আহার-পর্ব্ব শেষ করে সুব্রত চুরুট ধরালেন।

এই নিশীথ রাত্তিরে কোন দিকেই কিছু শোনা যাচ্ছিল না। রোগীও বোধ হয় এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে। দূরে—একখানা ট্রেণ হু হু করে চলে গেল, সেও অল্পক্ষণের জন্যে। দোরের ফাঁক দিয়ে শীতের কন্‌কনে বাতাস ঘরে ঢুকছিল।

সুব্রত বল্‌লেন, "একবার ওঘরে যাবে নাকি ?"

"কেন ?"

"চিরব্রত ওখানে পড়ে আছে।"

"কি হয়েছে ?" ডাক্তারের চোখে মুখে ভয়ানক আশঙ্কা ফুটে উঠলো।

"তা বলবো'খন, আগে তাকে দেখবে চল।"

ধীরেশ পাশের ঘরে এসে দেখলেন, একটা ক্যাম্পখাটের ওপর

আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে চিরব্রত শুয়ে আছে। কম্বলের খানিকটা তুলে দেখলেন, তার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত, তখনও রক্ত ঝরছে।

ধীরেশ বললেন, "একে নিয়ে যেতে হবে, এখানে থাকলে তো কিছুই হবে না।"

"তা বেশ নিয়ে যাও, এরা পৌঁছে দিয়ে আসুক।"

ডাক্তার উৎকণ্ঠিত হয়ে জিগেস্ করলেন, "কিন্তু ব্যাপার কি ?"

"পরে শুনবে।"

তারপর দোরটা বন্ধ করে, তাঁরা এ ঘরে এসে বসলেন।

চিরব্রত, সুব্রতর ছোট ভাই। নিজের এই এত বড় বিপদেও সুব্রতর সহজ স্বচ্ছন্দ আচরণে ডাক্তার অবাক হয়ে গেলেন। ওঘরে ছোট ভাই ঐ ভাবে পড়ে আছে, এঘরে বড় ভাই রসিকতার সঙ্গে এই মাত্র আহার-পর্ব্ব শেষ করলেন। তাঁর মুখে এতটুকুও চিন্তার রেখা নেই। ধীরেশের কাছে এই ব্যাপার যেমন অদ্ভুত তেমনি বিসদৃশ। অন্য কেউ হলে ডাক্তার তাঁকে হৃদয়হীন পশু বলে ভাবতেন, কিন্তু তিনি যে সুব্রতকে খুব ভাল করেই চেনেন। তিনি যে জানেন, এই মানুষটির হৃদয় যেমন মেয়েদের মত নরম, তেমনি পাষাণের মতই শক্ত। বিপদে পড়লে এই লোকটির কোথা থেকে যে এতখানি সাহস, এত বুদ্ধি, এত ধৈর্য্য আসে, দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। সুব্রতর ওপর ধীরেশের অপরিসীম

ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও আজিকার এই অমানুষিক আচরণে তিনি মনে মনে বড়ই বিরক্ত হলেন। হবার আরো একটা কারণ—চিরব্রতকে ধীরেশ নিজের ভায়ের মতই স্নেহ করতেন। তার এই এত বড় বিপদে ডাক্তারের মন বড়ই খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তাই সুব্রতর এইরূপ আচরণে সহজেই তা তিক্ত হয়ে উঠলো।

যাবার সময় সুব্রত সেই হাল্কা হাসি মুখে বোট্ পর্য্যন্ত তাঁদের তুলে দিয়ে এলেন। ফেরবার সময় অজ্ঞান ভায়ের দিকে একবার চাইলেনও না। তাঁর এই অদ্ভুত ব্যবহারে ধীরেশের কেবলি মনে হচ্ছিল—অন্যের সামান্য অসুখ-বিসুখে যে প্রাণ দিয়ে কত সেবা করে, নিজের ভায়ের এই অবস্থায় সে কি করে এমন নির্ম্মম হয়ে আছে!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চিরব্রতের ভাল করে সেরে উঠতে অনেকদিন লাগল। কিন্তু, নিরাময়ের এ আনন্দ তো বেশী দিন থাকলো না, কেন-না, চিরব্রতের সম্বন্ধে সুব্রতর কাছ থেকে তিনি এই মাত্র অতি নিষ্ঠুর আদেশ পেয়েছেন। ধীরেশ জানতেন, তাঁর বন্ধুর মুখ দিয়ে যে কথা একবার বের হয়ে যায়, তা আর বড় নড়চড় হয় না, তাই চিরব্রতের জন্যে তাঁকে বড়ই ভাবিয়ে তুলেছে।

সুব্রতর দেখা পাওয়া যায় কোথায়? সে যে কোথায় থাকে, কোথায় খায়, কোথায় গেলে তার দেখা মেলে, তা তো কিছুই ঠিক নেই; আজ এখানে তো কাল বোম্বাই, কাল বোম্বাই তো পরশু মাদ্রাজ—এমন অনিশ্চিত গতিবিধি যার, তার ধরা ছোঁওয়া তো ভারি মুস্কিল—তবু তাকে পাকড়াও করতেই হবে—যেমন করে হোক্। ধীরেশ, চিরব্রতকে জিগেস্ করলেন,—কোথায় গেলে তার দাদার দেখা পাওয়া যাবে?

সে বল্‌লে, "খুব সম্ভব বাহার জানে দাদা কোথায়।"

বাহারের ঠিকানা নিয়ে ধীরেশ, সুব্রতর খোঁজে বেরুলেন। চিরব্রত হোষ্টেলের যে রুম্-নম্বর বলে দিয়েছিল সেই ঘরে ঢুকে

তিনি দেখলেন, একটি ছেলে চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে। তাকে দেখে ধীরেশের যেন চেনা-চেনা মনে হোল। ছেলেটিও উঠে এসে, অতি পরিচিতের মত তাঁকে নমস্কার করলে।

ধীরেশ তাকে জিগেস্ করলেন, "আপনাকে কি কোথাও দেখেছি ?"

ছেলেটি হেসে বল্‌লে, "চিরব্রতের জন্যে আমি আপনাকে আনতে গিয়েছিলুম।"

"ঠিক্ ঠিক্, তাই চেনা-চেনা বোধ হচ্ছে। * * আপনাদের দাদা কোথায় ?"

"কাছেই আছেন।"

"একবার খবর দিতে পারেন ?"

"বসুন, আমি তাঁকে নিয়ে আসছি।"

বাহার তক্ষুণি চলে গেল। সে যাবার পর ধীরেশ ঘরের চারিদিকটা একবার দেখে নিলেন,—টেবিল-ক্লথটা তেল কালি ডাল ও রসগোল্লার রসে চিত্রবিচিত্র, খাটের ওপর বই খাতা বালিশ চিঠি কাপড় জামা একাকার, মশারীর একটা কোণ সুতোর অভাবে গামছা দিয়ে বাঁধা, ফুটো কুজো দিয়ে জল ঝরে মেঝের খানিকটা ভেজা।

খানিক পরে সুব্রত হাসিমুখে এসে দাঁড়ালেন। ইভ্‌নিং ড্রেসে

তাঁর সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা, টুপির নীচে ধপ্‌ধপে মুখ দেখে বাঙ্গালী বলে মনে হচ্ছিল না। তিনি এসেই বল্‌লেন, "চল হে ডাক্তার, বেড়িয়ে আসা যাক্।"

ট্যাক্সী ইডেন-গার্ডেনের সামনে থামলো। বাগানে না-ঢুকে তাঁরা মাঠের ভেতর চল্‌লেন। কিছুদূর দিয়ে ঘাসের ওপর দুজনে সামনা-সামনি বসলেন।

"কি খবর বল তো, হঠাৎ যে বড় মনে করলে?"—সুব্রত জিগেস্ করলেন।

ধীরেশ উত্তর দিলেন, "খবর আর কি? দেখতে এলুম একেবারে উন্মাদ হতে তোমার আর বাকি কত?"

সুব্রত হো হো করে হেসে উঠলেন;—"ঠিক বলেছ ভাই, মাথা-ফাতা সব বিগড়ে গিয়েছে।"

"নিশ্চয়ই। নইলে শুধু শুধু—" একটু থেমে, বেশ উত্তেজিত হয়েই ধীরেশ জিগেস্ করলেন, "আমি জানতে চাই, এ আদেশ দেবার তোমার কি অধিকার আছে? ছোট ছেলে হাতে ছুরি পেয়ে যেমন যা তা কেটে বেড়ায়, হয় তো একটা ভাল কলমের গাছই শেষ করে দিলে, তোমরাও তেমনি ছেলেমানুষের মত যা তা করছো।"

সুব্রত ধীর ভাবে বল্‌লেন, "এ পর্য্যন্ত তুমি কি দেখেছ—যা খুসী তাই করতে?"

ধীরেশ নরম হয়ে উত্তর করলেন, "না, তা দেখিনি। কিন্তু চিরব্রতের ওপর তোমার এ নিষ্ঠুর আদেশ কেন?"

"কেন?—অবাধ্যতা"—এই বলে সুব্রত অন্ধকারের দিকে অপলক নেত্রে চেয়ে রইলেন। তাঁর এই উদাস দৃষ্টি ধীরেশকে মনে পড়িয়ে দিলে—বহুদিন আগে একবার চিরব্রতের চিঠি না-পেয়ে সুব্রত কী ছেলেমানুষের মতই কেঁদেছিল! সেই ভ্রাতৃস্নেহ তো মুছে যেতে পারে না! গেলে—দেশের কাজ কি করে সম্ভব? তবে, কিসের জন্যে নিজের সুখ দুঃখ সে বহুদিন বিসর্জ্জন দিয়েছে? —কিসের জন্যে? মাটীর জন্যে, না—মানুষের জন্যে? মানুষ না-থাকলে মাটীর দাম কি? ভায়ের ওপর যে-টান, সেই টান সকলের ওপরেই তার নিশ্চিত রয়েছে। তার হৃদয়ের সূক্ষ্ম তন্ত্রীজাল গগন ছেয়ে ভুবন ভরে আছে। মাদ্রাজের কোন্ অজ্ঞাতনামা পারিয়ার বা আসামের কোন্ অপরিচিত কুলির জন্যে যার প্রাণ কাঁদে, সে কত কষ্টেই না নিজের ভায়ের ওপর আজ এমন নির্ম্মম হয়েছে! আবার সেই কষ্ট, নিভৃত অন্তরের সেই মর্ম্মান্তিক বেদনা—কত সংযমেই না ঢেকে রেখেছে?—ধীরেশ এতক্ষণ তা বুঝতে পারেননি। সুব্রতর এই নিশ্চল নিস্পন্দ ভাব এখন মনের দুয়ার খুলে দিয়ে, তার ভেতরের রূপ চকিতের জন্যে দেখিয়ে দিলে।

ধীরেশ কোমল হয়ে বল্‌লেন, "চিরব্রতকে তোমায় ক্ষমা করতেই হবে, ভাই।"

সুব্রত কঠোর ভাবেই উত্তর করলেন, "তা হতে পারে না ডাক্তার, কখনো না।"

"কেন হতে পারে না?"

"হতে পারে না—তার কারণ আমার মনে হয়, চিরব্রত সমিতির খুবই অনিষ্ট করতে পারে। যখনি সে অধ্যক্ষের আদেশ অমান্য করেছে, যখনি—"

ধীরেশ বাধা দিলেন, "আদেশ অমান্য আর কি?"

ওকথার কোন উত্তর না দিয়ে, আগের কথার জের টেনে সুব্রত বল্‌লেন, "অধ্যক্ষকে অন্যায়রূপে যখন সে অবহেলা করেছে তখন সমিতির যে-কোন অনিষ্ট তার দ্বারা হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। শত সহস্র ভায়ের কল্যাণ যে-সমিতির ওপর নির্ভর করছে, একটা ভায়ের মায়ায় পড়ে সেই কল্যাণকর সমিতিটাকে তো আমি ভাঙ্গতে পারি নে, ডাক্তার!"

ধীরেশ বল্‌লেন, "ওকে কল্যাণকর আর বলো না, ভাই। দোষী নির্দোষী সকলকে সমভাবে সাজা দেওয়া যে সমিতির মূল মন্ত্র তা যদি কল্যাণকর—"

খুবই আশ্চর্য্য হয়ে, সুব্রত বাধা দিয়ে জিগেস্ করলেন,

"নির্দ্দোষীকে সাজা দেওয়া—ও কথাটা তো বুঝতে পারলুম না, ভাই।"

ধীরেশ সহজ ভাবেই বল্লেন, "তোমাদের যা উদ্দেশ্য তাতে দোষীরাই যে সাজা পায় তা নয়, অনেক নির্দ্দোষীকেও সাজা পেতে হয়।"

সুব্রত ঘাড় নেড়ে উত্তর দিলেন, "তা হয়। কিন্তু ডাক্তার, এ ছাড়া তো আর পথ নেই। লোকের দুঃখ আমি সইতে পারি নে ভাই, তাতে আমার বড় কষ্ট হয়, কিন্তু এ দুঃখ দূর করবারও তো আর কোন উপায় দেখছি নে। নদীর এক কূল বাঁধলে আর এক কূল ভাঙ্গে, তেমনি একজনের দুঃখ কমলে আর একজনের বাড়বেই, এর থেকে নিষ্কৃতি পাবার কি কোন উপায় আছে?" একটু থেমে তারপর ঈষৎ হেসে বল্লেন, "এক উপায় আছে ডাক্তার, সৃষ্টিটাকে ধ্বংস করা, অথবা একসঙ্গে সকলকে মুক্ত করে দেওয়া, কিন্তু এর কোনটাই করবার যে আমার শক্তি নেই!"

"কিন্তু তুমি যা করছো, তাতে তো এ দুঃখ কমবে না।"

"তা জানি, ডাক্তার। এই দুর্নীতি, এই অনাচার, অত্যাচার নিবারণ করতে গিয়ে কত দোষী—নির্দ্দোষী, কাপুরুষ—বীর যে কষ্ট পাবে, তার সংখ্যা নেই; কত মায়ের, কত বোনের চোখের জলে যে ধরিত্রী সিক্ত হবে তাও জানি; কিন্তু—"

"কিন্তু—, তোমার পাষাণ-হৃদয় তবুও বিগলিত হবে না—এই তো ?"

"না ভাই, তা নয় ; আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, এক বিরাট্ সর্ব্বপ্লাবী রক্তস্রোতে লক্ষ লক্ষ নরনারী ভেসে চলেছে, তাদের মর্ম্মভেদী হাহাকারে আমার বুক ছিঁড়ে যাচ্ছে। কতদিন আমি লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদেছি ডাক্তার, কত রাত্তির ঘুমুতে না পেরে পাগলের মত ছুটোছুটি করেছি। আমার ভাইদের জন্মে, আমার বোনদের জন্মে আমি অজস্র কেঁদেছি, অসংখ্য দিন অজস্র কেঁদেছি, বন্ধু, তবুও বাঁচাবার উপায় আমি খুঁজে পাইনি। যদি কোন উপায় থাকে, তবে এই দুর্গম পথেই তাদের চলতে হবে।"

ধীরেশ ব্যথিত হয়ে জিগেস্ করলেন, "তুমি কি পার সুব্রত, যা করছো তা থামিয়ে দিতে ?"

সুব্রত উদ্বেলিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "না ডাক্তার, আমি বহুদিন ভেবেছি—এ আমি পারবো না, এর শেষ করে দি, এ নিষ্ঠুর যজ্ঞে আমার কাজ নেই, কিন্তু ভাই, শত শত বছর ধরে আমার জাতির ওপর, আমার ধর্ম্মের ওপর, আমার দেশের নারীর ওপর যে অত্যাচার হয়েছে, তাদের বুক চাপা কান্না যেন কোন্ সীমাহীন অনির্দ্দেশ্য লোক হতে অগ্নিস্রোতে ভেসে এসে আমার সমস্ত মায়া, সমস্ত দয়াকে দগ্ধ করে দিবানিশি

শোনাচ্ছে—'ভাই, বড় অপমানিতা, বড়ই নির্য্যাতিতা—এ অপমান-ভার আর সইতে পারিনে, আমাদের লজ্জা দূর কর।' * * আমায় জোর করে কে যেন করাচ্ছে। আমার ভেতর আগুন যে-জ্বেলেছে, এ আগুন সেই নেভাতে পারে। আমার কোনো হাত নেই,—কিছুমাত্র নেই।"

নীরব নিস্তব্ধ এই প্রান্তর, ততোধিক নীরবতাময় প্রচ্ছন্নতা-ময় এই মানুষ,—তার ভাব, তার ভাষা, তার হৃদয়, তার বেদনা—ডাক্তারকে আজ নিতান্তই আকুল করেছে। এও কি সম্ভব? এত স্নেহ, এত ভালবাসা, এত করুণা—কি এই পাষাণ-হৃদয়ে? অথবা এই পাষাণ-হৃদয় কি এতই কোমল, এতই মধুর? নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে সুব্রত চেয়ে আছেন, আর ধীরেশ অপলক নেত্রে দেখছেন তাঁকেই, আর কেবলি ভাবছেন, ঐ আকাশের মতই বন্ধু, তুমিও অতি রহস্যময়!

অনেকক্ষণ পরে সুব্রত হেসে বল্‌লেন, "খোঁচা দিয়ে আমার সব কথা বের করে নিলে ডাক্তার, ভারি চালাক তুমি।"

ধীরেশও তেমনি সহাস্যে উত্তর করলেন, "আমার চাইতে তুমি বেশী চালাক, ভাই; ভেবেছ—এত কথা বলে আমায় ভুলিয়ে দেবে, কিন্তু তা পারবে না।" একটু থেমে তিনি উৎসাহের সঙ্গে আবার বল্‌লেন, "আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না?"

"কি কাজ ?"

"চিরব্রতকে তুমি আর একবার 'ট্রায়েল' দাও।"

সুব্রত জিগেস্ করলেন, "কি রকম ট্রায়েল ?"

ধীরেশ বল্‌লেন, "ওকে এমন একটা কাজ দাও যাতে ওর সমস্ত দোষ ধুয়ে যায়।"

খানিক ভেবে সুব্রত স্নিগ্ধ কণ্ঠে উত্তর কর্‌লেন, "এ বিচারের ভার আমি নিতে পারবো না, ডাক্তার। তুমি বরং আর সকলকে বল, তাদের যা মত হবে, তাতে আমার অমত নেই—" এই বলে সুব্রত উঠলেন।

তখন দক্ষিণের বাতাস অধীর হয়ে বইছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কমলের পড়বার ঘরে দোর বন্ধ করে রেণু গরীব ছেলেদের জন্যে কতকগুলো জামা তৈরী করছিল। তখন অপরাহ্ণ। আজ সুব্রতর এখানে আসবার কথা—পাঁচটায়। এর মধ্যে আরো দু-তিনবার সুব্রত, রেণুর সঙ্গে দেখা করে গিয়েছেন। এই অল্পদিনের ভেতরই তাঁর ওপর রেণুর বেজায় শ্রদ্ধা হয়েছে। কোন সঙ্কোচ নেই, কোন দ্বিধা নেই;—তিনি এলেই তার মনের বাঁধন যেন আপনি আল্‌গা হয়ে যায়।

রেণু সেদিন সুব্রতকে বলেছিল—কাছেই তার দুটি বন্ধু থাকে। খুব ভাল মেয়ে তারা; তার ইচ্ছে—দাদা একবার তাদের সঙ্গে দেখা করেন। সুব্রত রাজী হয়েছিলেন, আজ তাই তাঁর আসবার কথা।

দোরে কে ধীরে ধীরে আঘাত করলে। রেণু তাড়াতাড়ি দোর খুলে দিল। প্রথমে কমল তারপর সুব্রত হাসিমুখে ঘরে ঢুকেই জিগেস্ করলেন, "কেমন আছ, দিদি?"

রেণু খুসী হয়ে বল্‌লে, "ভালই। কিন্তু আপনি এই কদিনের ভেতর এত রোগা হয়ে গিয়েছেন কেন?"

"রোগা হওয়া ভাল, রেণু, খোরাক্ কমে যায়; নেমন্তন্ন করতে কেউ ভয় পায় না।"—এই বলে সামনের একটা চেয়ারে তিনি বসলেন।

রেণু বল্‌লে, "দাদা, আপনি একটু বসুন, আমি তাদের ডেকে নিয়ে আসি।"

সে চলে গেলে, কমল বাড়ীর ভেতর থেকে এক থালা খাবার এনে সুব্রতর সামনে রাখলে। তিনি বল্‌লেন, "আঃ, বাঁচালে কমল, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছিল।"

কমল জিগেস্ করলে, "আরো আনবো?"

সুব্রত বল্‌লেন, "না—থাক্। কিন্তু তুমি যে খেলে না?"

"পরে খাব।" তার কথা শেষ হতে-না-হতে রেণু বন্ধুসহ ঘরে ঢুকলো। তারা এসে তিনজনে তিনখানা চেয়ারে বসলো। বড় ও ছোট বোন্‌কে দেখিয়ে রেণু বল্‌লে, "এর নাম—দয়া, আর এর নাম—মায়া।"

সেই দুর্দান্ত দয়া, ছেলেবেলায় কমলরা যাকে খুবই ভয় করতো,—এখন যেন একেবারে বদ্‌লে গিয়েছে; অত্যন্ত সলজ্জ আর মুখখানি করুণামাখা, মায়া সর্ব্বদাই হাসিখুসী।—দুজনেই কুমারী।

সুব্রত খেতে খেতে জিগেস্ করলেন, "তোমাদের কত দিনের আলাপ, রেণু?"

সে হেসে বল্‌লে, "অনেক দিনের ; আমরা এক স্কুলে পড়তুম। তারপর আমি স্কুল ছেড়ে দিলুম ; ওরা পাশ করে গিয়ে কলেজে ভর্ত্তি হোল।"

সুব্রত পরিহাস করে বল্‌লেন, "স্কুল ছেড়েছ বলেই তো যত দুষ্টুমি এসে তোমার ঘাড়ে চেপেছে, কেবল দেশের কাজ, আর দেশের কাজ।" তারপর পরিহাস রেখে সহজ ভাবে তিনি বল্‌লেন, "কত সৌভাগ্য আমাদের রেণু, যে তোমাদের মত মেয়ের এ দিকে মতি হয়েছে। আরো কত মেয়ে তো রয়েছে, তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য—সুখী হওয়া ; কিন্তু সুখ তাদের কপালে ভগবান লেখেননি। জীবনের যে একটা সার্থকতা আছে—তা তারা জানেই না।"

"কেন জানে না ?"—মায়া জিগেস্ করলে।

সুব্রত বল্‌লেন, "তারা যে ভাব হারিয়ে ফেলেছে। বিভিন্ন ভাব নিজের জীবনে ফুটিয়ে তোলাই তোমাদের সাধনা। যেমন ধর, যার হৃদয় নিঃস্বার্থ ভালবাসায় পূর্ণ, সকলকে ভায়ের মত ভালবাসতে যার ভাল লাগে, দেশের কাজ সে সেই ভাবেই করবে। যার বে' হবে, তার একমাত্র কর্ত্তব্য—স্বামীকে মানুষ করা, যাতে সে নিঃস্বার্থ হতে পারে, যাতে তার মন তুচ্ছ ভোগায়তন থেকে উঠে গিয়ে দেশের কল্যাণের জন্যে সমস্ত দুঃখ বরণ করতে পারে, স্ত্রীর যা অক্ষুণ্ণ দাবী—তা ভুলে গিয়ে, যাতে স্বামীর অন্তঃকরণ

বজ্রের মত কঠোর হয়, নিজের কর্ম্মে ও আচরণে তার সেই বীরত্ব জাগিয়ে দেওয়াই জায়ার একমাত্র সাধনা। তারপর মাতৃভাব—এর তুলনা নেই, মায়া। এই মায়ের রূপে সকলকে তোমরা বল দাও, সাহস দাও।"

দয়া বল্‌লে, "কিন্তু মেয়েরা তো এসবের কোন ধারই ধারে না।"

সুব্রত উত্তর দিলেন, "সেইজন্যেই তো তারা আজ মরে আছে। তারা মরে আছে বলে, পুরুষরাও মরে গেছে। পুরুষদের অন্তরের শক্তি, মনের সাহস, কর্ম্মের প্রেরণা সব মেয়েদের কাছে। মেয়েরাই তাদের সামর্থ্য দেবে, নিজেদের জীবন বিনিময়ে তাদের জীবনী দেবে। পুরুষদের মনের ওপর যে আবরণ রয়েছে—সেই আবরণটুকু তোমরা ভেঙ্গে দাও, দয়া।"

মায়া জিগেস্ করলে, "আমাদের কি করতে হবে বলুন ?"

সুব্রত বল্‌লেন, "কি করতে চাও, তাই বল।"

মায়া একটু থেমে উত্তর দিলে, "এই যেমন মেয়েদের স্কুল কলেজে লিফ্‌লেট ছড়ান।"

সুব্রত বল্‌লেন, "ও সব এখন থাক—পরে জানাব।"

খানিক পরে দয়া আর মায়া চলে গেল।

তারা যাবার পর রেণুও খুব খুসী হয়ে বাড়ী গেল। আজ তার মনের আনন্দ সে যেন কিছুতেই চেপে রাখতে পারছিল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কমলরা যখন এমনি মাতব্বর হয়ে উঠেছে, তখন মনা দত্তকে চেনে না—সহরে এমন লোকই ছিল না। তাঁর ঘরোয়া নাম মনোমোহন দত্ত, কিন্তু ওনামের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ছাড়া বোধ হয় আর কেউ পরিচিত ছিলেন না।

অগাধ পয়সা, ইউরোপিয়ান্ কোয়ার্টারে বাড়ী, এ্যারিস্-ট্রোকেটিক্ চাল্,—এক শ্রেণীর লোকের কাছে তিনি আদর্শ পুরুষ। কিন্তু কেউ তাঁকে মিঃ দত্ত, বা মনোমোহন বাবু বলতো না, ঐ 'মনা দত্ত' বলেই ডাকতো—বাবুর্চি বেয়ারারাও, অবশ্য আড়ালে। খুব মোটা বর্ম্মা চুরুট সব সময় তাঁর মুখে থাকতো, কথা বলবার সময় ঠোঁট দিয়ে সেটা চেপে ধরতেন, উত্তেজিত হলে মাটীতে ফেলে বুট্ দিয়ে পিষে ফেলতেন। সুব্রতদের ওপর তিনি মোটেই খুসী ছিলেন না; বল্‌তেন—ওরা ভণ্ড, জোচ্চোর, ডাকাত। যেখানে সেখানে তাঁদের দুর্ণাম রটিয়ে বেড়াতেন। বদ্‌মায়েস্ লোকেরা খবর পেয়েছিল—তিনি তাঁদের সমিতির প্রেসিডেণ্ট হবার ইচ্ছে ইঙ্গিতে বহুবার জানিয়েছেন, কিন্তু ছেলেরা মোটেই আমোল দেয় না, তাই তাদের ওপর মনা দত্তর

এত রাগ। ছেলেরা মাঝে মাঝে তাঁকে গিয়ে বলতো,—কেন আপনি তাদের পেছনে এত লেগেছেন? তারা ত আপনার বা আর কারুর কোন অনিষ্ট করেনি। তিনি ধৈর্য্য ধরে তাদের সব কথা শুনতেন, এক বাটী করে চাও খাওয়াতেন, হাসিমুখে বিদায় দিতেন, কিন্তু যা করবার তা নির্ব্বিবাদে করে যেতেন। শেষে ছেলেরাও ক্ষেপে উঠলো, বল্লে—'দেখে নেব মনা দত্তকে, তার ভিটেয় ঘুঘু চরাব।'

—এ হেন মনা দত্তকে ঘাল্ করবার ভার পড়লো চিরব্রতের ওপর।

একদিন দুপুর বেলা তিনি গাড়ীতে উঠছিলেন, খানিক দূরে চিরব্রতও ঠিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গাড়ী গেটের বাইরে এলেই দুচার ঘা বসিয়ে দিয়ে সরে পড়া—এই ছিল তার মতলব। যখন তিনি বেরিয়ে এলেন, তখন একটি মহিলা রাস্তার দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন, তাঁর দুটি চোখে বিদায়ের অশ্রু টল্‌টল্ করছিল। শুধু একটিবার—একটিবার মাত্র দেখেই চিরব্রত আর চোখ ফেরাতে পারলে না। একি, এ যে শোভা! নিশ্চয়ই শোভা—সেই মুখ, সেই চোখ; তবে কি মনা দত্ত, শোভার স্বামী? কি মুস্কিল! দত্তের গাড়ী তার সামনে দিয়ে চলে গেল, তবু সে তেমনি-ই নিশ্চেষ্ট ভাবে দাঁড়িয়ে রইলো। চিরব্রত ভাবছিল, যদি না দেখতে পেতুম, যদি শোভা বাইরে

এসে না দাঁড়াত, তবে তো এক্ষুণি একটা বিশ্রী ব্যাপার হয়ে যেত। তবুও সন্দেহ হোল—যদি সে শোভাই হয় তবে দাদা তো নিশ্চয়ই জানেন। জেনে শুনেও কি তার স্বামীকে সায়েস্তা করবার ভার আমারি ওপর দিয়েছেন! কতদিন তার সঙ্গে খেলেছি, গল্প করেছি, চুরি করে এক সঙ্গে কত কি খেয়েছি। যখন তার বাবা বদলি হয়ে গেলেন তখন সে আমার জন্যে কত কেঁদেছিল; নিজের বোনের মত যে—সেই শোভার স্বামীকে কি আমাকেই শিক্ষা দিতে হবে?

কিন্তু, সেই সংশয় আবার ফিরে এল। চিরব্রতের মনে হোল, হয় তো তার ভুল হয়েছে, হয় তো আর কাকেও সে দেখেছে! সত্যি কি করে জানা যায়? হঠাৎ একটা বুদ্ধি তার মাথায় এল।

চিরব্রত গেট্ পার হয়ে মনা দত্তের বাড়ীর বারান্দায় এসে দাঁড়াল, চেনে বাঁধা কুকুরটা অপরিচিত লোক দেখে ঘেউ ঘেউ করে উঠল। তার চীৎকারে নেপালী চাকরটা বেরিয়ে এসে জিগেস্ করলে, "কি চান আপনি?"

চিরব্রত বললে, "মিঃ দত্তের সঙ্গে আমার কাজ আছে।"

"তিনি তো এই সবে বেরিয়ে গেলেন।"

"কখন ফিরবেন?"

"তা তো ঠিক বলতে পাচ্ছিনে। তিনি বীরভূম গিয়েছেন, সেখানে সভা আছে। হয় তো কাল, পরশু ফিরবেন।"

"আচ্ছা, তা হলে—" এই বলে চিরব্রত পকেট থেকে কাগজ পেন্সিল বের করে তাতে নিজের নাম লিখে, সেটা চাকরের হাতে দিয়ে বললে, "এই চিঠিখানা বাড়ীতে দিও, তিনি ফিরে এলে যেন তাঁকে দেওয়া হয়।"

সে ভেতরে চলে গেল, চিরব্রত বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। ভাবলে,—মেয়েরা স্বভাবতঃই কৌতূহলা, স্লিপ্‌ট মনা দত্তের স্ত্রী নিশ্চয়ই পড়বেন, তিনি যদি শোভা হন, তবে তো কথাই নেই—এক্ষুণি আমার ডাক পড়বে—আর যদি না-ই হন, তা হলেও বিশেষ ক্ষতি নেই, আমার নামে তো কত লোকই আছে, কে কাকে চিনবে?

খানিক পরেই নেপালী চাকর ফিরে এসে চিরব্রতকে ডেকে নিয়ে গেল। দোতলার সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে শোভা তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। তাকে দেখেই সে খুব খুসী হয়ে বলে উঠলো, "কি ভাই, এতদিনে বুঝি মনে পড়লো?"

থতমত খেয়ে চিরব্রত উত্তর দিলে, "আমি যে তোমার ঠিকানা জানতুম না, অনেক কষ্টে খুঁজে খুঁজে এসেছি। যাক্, এখন তোমরা কেমন আছ তাই বল।"

"আমরা তো ভাল আছি, তুমি কেমন আছ? ওঃ, কতদিন পরে দেখা হোল।"

চিরব্রত আর কোন কথা খুঁজে না পেয়ে চুপ করে রইল।

একটি উলঙ্গ ছোট ছেলে চোখ মুছতে মুছতে পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ছেলেটি শোভার। সে এতক্ষণ ঘুমুচ্ছিল, তার মায়ের আর চিরব্রতের কথাবার্তায় জেগে উঠেছে।

চিরব্রত তাকে কোলে নিয়ে বল্‌লে, "বাঃ, খাসা ছেলে, খুব সুন্দর হয়েছে তো।" অপরিচিত লোকের কোল থেকে নেমে আসবার জন্যে সে ক্রমাগত ছট্‌ফট্‌ করছিল।

খোকাকে নিজের কোলে নিয়ে শোভা বল্‌লে, "যা দুষ্টু হয়েছে, ভাই, সারা দিন আমায় নাচিয়ে বেড়ায়, বসবার জো নেই। দুটো আয়া রেখেছি, তাই কি সামলাতে পারি ?"

চিরব্রত পরিহাস করে বল্‌লে "আর তুমিই বুঝি খুব লক্ষ্মীটি ছিলে ?"

শোভা মুখ টিপে হাসতে লাগলো। তারপর লজ্জিত হয়ে বলে উঠলো, "দেখেছো, কথায় কথায় তোমায় বসতেও বলিনি ; এসো এসো"—এই বলে চিরব্রতকে পাশের ঘরে নিয়ে গেল। দুটো চেয়ারে সামনা-সামনি বসে শৈশব-ছবিগুলির ওপর বিস্মৃতির যে ধূলো পড়েছিল তা ঝেড়ে মুছে তারা আজ দেখতে লাগলো। সেই সুকুমার জীবনের যত মমতা, স্নেহ ও কলহ সবই যেন আজ অনাবিল মাধুর্য্য-সলিলে অবগাহন করে, এক অপরূপ রূপে, একে একে, তাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। ক্ষণেকের জন্যে শোভা ভুলে গেল—সে বিবাহিতা,

সে জননী, তার স্বামী আছে, সংসার আছে। চিরব্রতও ভুলে গেল—কি জন্যে সে এখানে এসেছে, তার কর্ত্তব্যের সঙ্গে শোভার ভাগ্যের কতখানি সম্বন্ধ। এই ক্ষণেকের জন্যে সহরের সমস্ত কোলাহল, সমস্ত কর্ম্মস্রোত যেন ডুবে গিয়ে সহসা তাদের মনে ভেসে উঠলো,—পাশাপাশি সেই দুখানি বাড়ী, বোসেদের সেই কাঁচামিঠে আমের গাছ, দুপুর বেলায় যখন সকলে নিদ্রাতুর তখন দুটি বালক-বালিকার সেই চুরি করে আম পাড়া, ক্ষেতে ক্ষেতে ঘুরে সেই মটরসুটি, ধনেশাক তুলে আনা, নদীর বালুচরে সেই ছুটোছুটি, মারামারি,—কত কথা, কত হাসি, কত কান্না যে, স্মৃতির সুধার সাগর হতে আজ মন্থিত হল, তা বলবার নয়।

এমন সময় নেপালী চাকর এসে খবর দিলে, "মা, বাবু ফিরে এসেছেন।"

"ফিরে এসেছেন কিরে?"—এই বলে শোভা কৌতূহলী হয়ে দাঁড়ালো।

চিরব্রতের বুকের স্পন্দন তখন যেন থেমে গিয়েছে। তার ভয়ানক সন্দেহ হোল, তবে কি মনা দত্ত টের পেয়েছেন—আমি তাঁকে সায়েস্তা করতে এসেছিলুম, এখনো তাঁর বাড়ীতে বসে আছি?

বারান্দায় পদশব্দ শোনা গেল। শোভা বাইরে এসে জিগেস্ করলে, "ফিরে এলে যে?"

চিরব্রত ভেতরে বসেই শুনতে পেলে, "হঠাৎ বিশেষ কাজ পড়ে গিয়েছে, তাই আর যাওয়া হোল না, বীরভূমে 'তার' করে দিয়েছি।"—এই বলে তিনি দোরের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

চিরব্রত চেয়ার ছেড়ে উঠে, হাত জোড় করে নমস্কার করলে। তাকে দেখিয়ে শোভা হেসে জিগেস্ করলে, "একে চেন ?"

চিরব্রতের আপাদমস্তক একবার চকিতে দেখে নিয়ে মনা দত্ত বল্লেন, "চিনতে পারছিনে তো !"

শোভা তেমনি হেসে বল্লে, "চিরব্রত। এর কথা তো তোমায় কতদিন বলেছি। বাবা যখন মেদিনীপুরে বদলি হয়ে গিয়েছিলেন, তখন এদের সঙ্গে আমাদের খুব ভাব হয়। ওর মা আমায় ঠিক নিজের মেয়ের মতই দেখতেন।"

চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে মনা দত্ত বল্লেন, "ও—, আপনিই চিরব্রত বাবু, বসুন, বসুন। এতদিন আসেননি কেন ? ইনি যে আপনার কথা প্রায়ই বলেন।"

যতদূর সম্ভব—সহজ গলায় চিরব্রত উত্তর করলে, "সময় পাই নে, পড়াশোনার ঝঞ্ঝাট।"

"আপনি বুঝি এবার এম-এ দেবেন ?"

"না—, আসছে বছর।"

"বেশ, বেশ, চা টা খাওয়া হয়েছে ?"

চিরব্রত লজ্জিত হয়ে বল্‌লে, "এখনো খাইনি।"

শোভার দিকে চেয়ে পরিহাস করে মনা দত্ত বল্‌লেন, "সে কি ? ভাল করে খাওয়াও তবে তো আবার আসবেন।"

খাবার আনতে সে অন্য ঘরে চলে গেল।

* *

আরো খানিকক্ষণ বসে, শোভা ও তার স্বামীর সঙ্গে গল্প করে চিরব্রত যখন চলে গেল তখন তৃতীয়ার চাঁদ আকাশে ঝিক্‌মিক্ করছে। জনস্রোত ঠেলে পথ চলতে চল্‌তে সে কেবলি ভাবছিল,—দাদা এবার আর আমায় আস্ত রাখবে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ধীরেশ ডাক্তারের বাড়ীতে সেদিন সুব্রতর নিমন্ত্রণ। তেতলার ঘরে বসে দুই বন্ধুতে কথাবার্ত্তা হচ্ছিল। পশ্চিমের জানালা খোলা। সেই খোলা জানালা দিয়ে আকাশের চাঁদ আর গঙ্গার জল দেখা যাচ্ছিল। জলে পড়েছে চাঁদের ছবি, আলোর রেখা—ঢেউগুলি তাদের নিয়ে খেলছিল।

ধীরেশ হঠাৎ জিগেস্ করলেন, "ভাই, তোমার উদ্দেশ্য তো আমি কোনদিনই বুঝতে পারলুম না।"

সুব্রত বল্লেন, "আমাদের উদ্দেশ্য মানব-সমাজের সেবা আর মুক্তি।"

ধীরেশ পরিহাস করে বল্লেন, "যেমন—মনা দত্তকে ঘাল করা। খুব যা হোক্; লাঠি দিয়ে সেবা—এ তোমার নতুন আবিষ্কার, ভাই। আর তাতে সে মুক্তিও পাবে, একেবারে—।"

সুব্রত সহজ ভাবে উত্তর করলেন, "কাজের ভেতর ভালমন্দ কিছু নেই। উদ্দেশ্য নিয়ে স্থির হয় কোন কাজটা ভাল, আর কোনটা মন্দ।"

"একটু পরিষ্কার করে বল। তোমার ওসব হেঁয়ালি আমি ভাল বুঝতে পারি নে।"

সুব্রত হেসে বল্লেন, "তুমি তো ডাক্তার, কত লোকের গায়ে ছুরি চালাচ্ছ, তাই বলে কি তাদের সঙ্গে তোমার শত্রুতা আছে? ছুরি না-চালালে অনিষ্ট হবে বলেই ফোড়ার ওপর তোমায় ছুরি চালাতে হয়। তেমনি বিশ্ব-মানবের এই বিরাট্ শরীরের কোন অংশ যখন পচে যায়, যখন তা গলিত হয়ে ওঠে, তখন নির্ম্মম হয়ে তার ব্যবস্থা করতে হয়, নইলে শরীরের শিরা-উপশিরায় সেই বিষ সংক্রামিত হয়ে সমগ্র মানব-সমাজের ধ্বংস এনে দেবে।"

"এই রকম করেই বুঝি তুমি মানব-কল্যাণ আনবে?"

"কল্যাণ কারুর জন্যেই কেউ আনতে পারে না, ভাই, নিজেকেই তা অর্জ্জন করতে হয়।"

ধীরেশ জিগেস্ করলেন, "আচ্ছা, কারুর ওপর তোমার কোন রাগ নেই?"

সুব্রত বল্লেন, "না—কিছুমাত্র না। সকলকে ভাই বোনের মতই আমি ভালবাসি, তবুও কর্ত্তব্যের খাতিরে চিরব্রতকে যেমন দণ্ড দিতে হয়েছে, আমাদের পথে যারা বাধা দেবে তাদেরও তেমনি আমায় বাধ্য হয়ে শাস্তি দিতে হবে।"

ধীরেশ আশ্চর্য্য হয়ে বসে রইলেন। তাঁর বন্ধু-চরিত্র দিন দিন বড়ই অদ্ভুত মনে হচ্ছে। তাঁর হৃদয় যেমন করুণাপূর্ণ, আবার

তেমনি নির্ম্মম ; বাঁ হাতে অশ্রু মুছে ডান হাতে সুব্রত যে-কোন প্রিয়জনকে শাসনে জর্জ্জরিত করতে পারেন ! মানব-সাধারণের সঙ্গে এই বন্ধুর যোগাযোগ কোন দিন কি হবে ? বোধ হয়—না। বোধ হয়—উল্কার মত ক্ষণিক প্রভায় মানুষের মনকে ক্ষণিক চমৎকৃত করেই সে উধাও হয়ে যাবে।

খানিক পরে আগের কথা টেনে ধীরেশ জিগেস্ করলেন, "আচ্ছা, তুমি যে বললে—কল্যাণ কারুব জন্যেই কেউ করতে পারে না, তাকি ঠিক ?"

"হ্যাঁ তাই। তবে লোকে সাহায্য করতে পারে। যেমন ধর —গাছ ; জোর করে কি কেউ তাকে বাড়াতে পারে, না—বাঁচাতে পারে ? তবে আলো আর বাতাস তার বৃদ্ধির সহায়তা করে, বেড়ার আবরণ বাইরের অত্যাচার থেকে তাকে কিছুদিন আড়াল দিয়ে রাখে—এই পর্য্যন্ত। তেমনি মানুষের বাঁচবার বাধাকে সরিয়ে ফেলা, আর তার বিকাশের সুবিধে করে দেওয়া—এই দুটিই আমাদের কাজ ; কিন্তু এই কাজ করবার কতকগুলি উপায়ও আছে।"

"কি রকম ?"

সুব্রত হেসে বললেন, "তুমি বুঝি একদিনেই সব শুনে নিতে চাও ?"

ধীরেশ উত্তর করলেন, "যদি আপত্তি থাকে তবে বোলো না, ভাই।"

"আপত্তি আর কি? ধর, যেমন প্রধান উপায়—দেশের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মনোবৃত্তিকে দেশের ওপর শ্রদ্ধান্বিত করা। তার জন্যে চাই শিক্ষা, চাই সাহিত্য। শিক্ষাকে নরনারীর ভেতর ধূলোর মত ছড়িয়ে দিতে হবে। আর জেনো ডাক্তার, যখন যে-দেশ জেগেছে, তার পেছনে আছে জীবন্ত সাহিত্য; আমাদের দেশেও নব নব ভাবে নব নব আদর্শে সাহিত্য-সৃষ্টি চাই, সে সাহিত্য হবে বাতাসের মত পবিত্র, পাবকের মত জ্বলন্ত, আকাশের মত উদার ও অনন্ত। কিন্তু এসব কাজ যে করবে, প্রথমে তাকে হতে হবে শিক্ষিত ও মার্জ্জিত। তাকে ভাবতে হবে, শিখতে হবে—বহুর সুখেই তার সুখ, বহুর দুঃখেই তার দুঃখ।"

"থাম, থাম—ঢের হয়েছে!"—ধীরেশের মুখে বেশ অপ্রসন্নতার ভাব।

সুব্রত অবাক হয়ে জিগেস্ করলেন, "কেন, কি হলো তোমার?"

তেমনি অপ্রসন্ন হয়েই ডাক্তার জবাব দিলেন, "ওসব কখনো হবে? যা নয় তাই। হাওয়া দিয়ে তুমি জাল বুনছো।"

স্নিগ্ধ কণ্ঠে সুব্রত বল্লেন, "কি হবে, না হবে সে কথা তো হচ্ছে না; কথা হচ্ছে—কি হওয়া চাই। আর হবেই বা না কেন? আমাদের ছেলে-মেয়েরা ঐ সব কাজ নিয়ে দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে—তা জান?"

"সত্যি নাকি ?"

"সত্যিই—তবে দেশের লোক শুধু আমাদের ওপর নির্ভর করেই যদি পড়ে থাকেন, তা হলে বড়ই ভুল করবেন। এখন সকলকেই দেশের জন্যে কিছু-না-কিছু করতে হবে, কারুর বসে থাকবার আর সময় নেই।"

এর উত্তরে ধীরেশ কি বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় চিরব্রত এসে ঘরে ঢুকলো ; তার চোখে মুখে কেমন একটা অস্বাভাবিকতা। তাকে দেখে সুব্রত জিগেস্ করলেন,—

"কি রে, খবর কি ?"

"তোমার সঙ্গে কথা আছে"—এই বলে সে চুপ করলো।

ধীরেশ উঠে গেলেন। তখন চিরব্রত বললে, "আজ আমি প্রস্তুত হয়েই গিয়েছিলুম। তাঁর বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়েছিলুম, হঠাৎ দেখি—শোভা।"

সুব্রত বললেন, "শোভার সঙ্গে যে মনা দত্তের বে' হয়েছে ; তুই জানিস্ নে ?"

"আগে তা জানতুম না।"

"তারপর ?"

"তারপর, ফিরে এলুম।"

"কেন ?"

দাদার মুখের ওপরেই চিরব্রত বল্‌লে, "শোভার স্বামীকে অপমান করা আমার দ্বারা হবে না।"

ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে ধীরেশ উত্তেজিত হয়ে বল্‌লেন, "না হবে তো মরগে যাও।" তাঁর এমন উত্তেজিত্‌ হবার কারণও ছিল। চিরব্রতকে যখন শাস্তি দেবার হুকুম হোল, তখন তিনিই সুব্রতকে বলে কয়ে, একটা 'ট্রায়েল' দিয়ে তাকে ক্ষমা করবার ব্যবস্থা করেছিলেন। এখন তাঁর সে 'প্ল্যান্‌'ও নষ্ট হয়ে যায় দেখে তিনি আগুন হয়ে উঠেছেন।

দুই ভাই কিন্তু নিস্তব্ধ। দাদা আরো খানিক পরে চিরব্রতকে বল্‌লেন, "আচ্ছা, তুই এখন আয়।"

মুখ ভার করে সে যখন চলে গেল্‌, তখন তৃতীয়ার চাঁদের শেষ আলোটুকু একখণ্ড ধূসর মেঘের গায়ে লেগে রয়েছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সেদিন সকাল থেকেই খুব বৃষ্টি হচ্ছিল; মেঘের অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে ধরণী যেন আকুল হয়ে কাঁদছে। জানালার ধারে বসে রেণু অলস নয়নে চেয়েছিল;—জনবিরল পথে জলস্রোত, ভাড়াটে মোটরগুলো তারি ওপর যেন সাঁতার কেটে চলেছে, দুষ্টু ছেলেরা কাজের ভাণে রাস্তায় এসে ভিজছে। জানালার ফাঁক দিয়ে বৃষ্টির ঝাট্ এসে রেণুকে সিক্ত করছিল; —চূর্ণ কুন্তলে জলের কণাগুলি জমে তার সুন্দর মুখখানিকে বড়ই স্নিগ্ধ করেছে, প্রাঙ্গণের কদম গাছ থেকে বৃষ্টিধৌত পুষ্পসৌরভ ঘর-খানিকে ভরিয়ে রেখেছে।

কার পদশব্দে চমকে উঠে রেণু পিছন ফিরে দেখলে—কমল। তাকে দেখেই সে খুসী হয়ে বল্লে, "আজ আর বৃষ্টি থামছে না, কি বল কমলদা ?"

কমল উত্তর দিলে, "কি জানি ? * * দাদা এসে বসে আছেন, শীগ্গীর চল্।"

"এই বৃষ্টির মধ্যে এসেছেন ?"—এই বলে রেণু তাড়াতাড়ি উঠে, বাবার ওয়াটারপ্রুফটা সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে সুব্রতর সঙ্গে

দেখা করতে এল। এসেই দেখলে, তিনি একেবারে ভিজে গিয়েছেন, জামার প্রান্ত বয়ে টস্ টস্ করে জল পড়ছে। রেণু কমলের দিকে চেয়ে, পদ্মদলের মত বড় বড় চোখ দুটি তুলে, তিরস্কারের সুরে বল্‌লে, "এ কি কমলদা, তোমার তো বেশ আক্কেল; দাদাকে এই অবস্থায় ফেলে তুমি আমায় ডাকতে গিয়েছিলে?"

কমল লজ্জিত হয়ে, সুট্‌কেস থেকে তাড়াতাড়ি নিজের কাপড়, জামা, তোয়ালে বের করে দিলে।

সুব্রতর পরিত্যক্ত কাপড় ঘরের ভেতর মেলে দিতে দিতে রেণু জিগেস্ করলে, "এই বৃষ্টির মধ্যে কেন এলেন, দাদা?"

"পরে বলছি, এখন যেখান থেকে পার আমায় একটা সিগারেট এনে খাওয়াও"—এই বলে সুব্রত কমলের বালিশটা টেনে নিয়ে তাতে ঠেস্ দিয়ে বসলেন।

রেণু স্মিত হাস্যে কমলের জামার পকেট থেকে সিগারেট আর ম্যাচবক্স বের করে সুব্রতর সামনে রাখলে। সিগারেট ধরিয়ে প্রফুল্ল মুখে তিনি বল্‌লেন, "আসছে রবিবার 'মানব-সমিতির' সভা বসবে গঙ্গার ধারে একটা পাড়াগাঁয়। তোমাদের সকলকে সেদিন যেতে হবে।"

উৎসুকের দৃষ্টিতে রেণু জিগেস্ করলে, "কেন দাদা?"

"সেদিন চিরব্রতের বিচার।" তারপর সংক্ষেপে তার অবাধ্য-

তার ইতিহাস তিনি রেণু আর কমলকে বল্‌লেন। আরো খানিক কথাবার্ত্তা কয়ে, বৃষ্টি একটু থামলে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সুব্রত চলে গেলেন। যাবার সময় পিছন ফিরে আবার বল্‌লেন, "নিশ্চয় যেয়ো—যেমন করে হোক্।"

* *

গঙ্গায় ভাটা পড়েছে। কোলের কাছে বিস্তীর্ণ বালুচর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে; তীরের কানন তার ওপর একখানি ঘন, স্নিগ্ধ ছায়া ফেলেছে। স্থির হয়েছিল সেই বালুচরে সভা বসবে। সকলেই এসেছে—কমল, বাহার, কানু, রেণু, দয়া, মায়া, নীলা, গুলুদি, আরো অনেক ছেলেমেয়ে। ধীরেশ ডাক্তার খানিক পরে আসবেন, বলেছেন। কেবল আসেনি যার বিচার, সেই। চিরব্রত বলে পাঠিয়েছে, 'আমি কোন অন্যায় করিনি, ও-সভার বিচার আমি মানবো না।'

এখনও সভার অনেক দেরী। রেণু, গুলুদি আর দয়া রান্না করছে, নীলাকে নিয়ে মায়া গাঁয়ের ভেতর বেড়াতে গিয়েছে। কমলরা দুটো পান্‌সী নিয়ে 'বাচ্' খেলছে। খানিক দূরে একটা গাছের নীচে সুব্রত চুপ করে শুয়ে আছেন। নিস্তব্ধ বালুচর, অতি নিস্তব্ধ এই কানন-ভূমি। সেই নিস্তব্ধতাকে ছিন্ন করে, সহরের মুখর কোলাহল অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে

মাঝে তাঁর কানে ভেসে আসছে। সেই অস্পষ্ট কোলাহলকে বিশ্লিষ্ট করে, তার এক একটি কথা তিনি যেন আপন অন্তরে মৃদু গুঞ্জন ধ্বনীর মত শুনছেন,—জয়ের গান এই মুহূর্ত্তে যেমন মানুষকে উল্লসিত করছে, পরাজয়ের লাঞ্ছনা পর মুহূর্ত্তে তেমনি তার মুখে কলঙ্কের কালি ঢেলে দিচ্ছে, মৃত্যুর বিলাপ জন্মের আনন্দকে ঢেকে ফেলছে। কবে এর শেষ হবে? শেষ আছে কি-না কে জানে? সুকুমারী বালিকা সদা হাস্যময়ী, তার জীবনের ফুল দলে দলে ফুটে, কুঁড়ির ভেতরের গোপন গন্ধকে পাতার ফাঁকে ফাঁকে ছড়িয়ে দিচ্ছে, সহসা দুর্দ্দৈব এসে তাকে একেবারে দলিত মথিত করে চলে গেল; শরতের প্রভাতে যে শিশিরে সিক্ত হোত, ধরার ধূলিতে তার সর্ব্বাঙ্গ ধূসর হোল। এমন কি কেউ নেই, এই দুঃখের বেদনাকে যে একেবারে মুছে ফেলতে পারে? এমন কি কেউ নেই, অসংখ্য অসহায় নর-নারীকে যে সামর্থ্য ও সাহস দিতে পারে? সুব্রতর মন আজ বড়ই খারাপ হয়ে গিয়েছে,—মানবের দুঃখে তাঁর মর্ম্মস্থল বড়ই নিপীড়িত; কিন্তু এ দুঃখ দূর করবারও তাঁর কোন শক্তি নেই—এই মনে করেই তিনি খুব বেশী কষ্ট পাচ্ছিলেন। কাকেও বেঁধে অক্ষম করে, তারি সামনে কোন পরমাত্মীয়কে নির্য্যাতন করলে সে যেমন তাই দেখে—রাগে ও ক্ষোভে কেবল অসহ্য বেদনা পায় আর কিছুই করবার থাকে না, সুব্রতও তেমনি অনুভব

করছিলেন—মানবের দুঃখ অনন্ত কিন্তু তিনি নিতান্তই অক্ষম; এ দুঃখ নিঃশেষে মুছে ফেলবার তাঁর কোনই সামর্থ্য নেই।

একখানি সজল মেঘ এসে আকাশ আচ্ছন্ন করলে। চারিদিক অন্ধকার হয়ে এলো,—ঠিক যেমন দিবা ও রাত্রির সন্ধিক্ষণে পৃথিবী ধীরে ধীরে মুদিত হয়ে আসে। সুব্রতর মনে হোল—এমনি করে মৃত্যু আমাদের সকলকে ঢেকে দিক্, এই দুঃখের চির অবসান হয়ে যাক্, এই তিমিরের সেতু পার হয়ে আলোকের রথ যেন আর কখনো এ রাজ্যে ফিরে না-আসে!

তিনি যখন নিজের মনে এই রকম ভাবছিলেন তখন রান্না শেষ হয়ে বসবার জায়গা হচ্ছিল। তাঁর সেদিকে কোন খেয়ালই নেই, রেণু এসে তাঁকে ডেকে নিয়ে গেল।

খাওয়া শেষ হলে, খানিক পরে সভা বসলো। তখন গঙ্গায় জোয়ার এসেছে। সাগরের জল কল্ কল্ করে ছুটে এসে বিস্তীর্ণ বালুকাচরটি ডুবিয়ে দিচ্ছে। কাজেই, তীরের ওপর ছেলে-মেয়েরা বসলো—দুদিকে মুখোমুখী হয়ে; মাঝখানে বসলেন সুব্রত। চিরব্রতের বিরুদ্ধে যা যা অভিযোগ তা তিনি সকলকে বুঝিয়ে দিলেন, তারপরে চাইলেন মতামত। ছেলেরা বল্‌লে, তাকে আরো কঠিন শাস্তি দেওয়া হোক্; মেয়েরা বল্‌লে, সে তো কিছুই অন্যায় করেনি—শুধু শুধু কেন শাস্তি দেবে?

বাহার মুখ লাল করে মেয়েদের জিগেস্ করলে, "অন্যায় করেনি কি রকম?"

বাঘিনীর মত দয়া লাফিয়ে উঠে, ঘাড় বেঁকিয়ে উত্তর দিলে, "কি অন্যায় করেছে—শুনি? শোভার স্বামীকে অপমান করতে চায়নি—এই তো? আমি যদি শোভা হতুম, আর তুমি যদি তাকে অপমান করতে, তা হলে—" এই কথা শুনে ছেলে-মেয়েরা হো হো করে হেসে উঠলো। দয়া প্রথমে কিছুই বুঝতে পারেনি, তারপর যে-বেফাঁস কথাটা বেরিয়ে গিয়েছে তাই মনে করে সে লজ্জায় যেন মরে যাচ্ছিল। রেণু তাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে বললে, "বাহার, তুমি থাম। চ্যাঁচাতে পার বলে ভেবনা তুমি খুব বুদ্ধিমান। * আমি তোমাদের সকলকেই জানাচ্ছি—চিরব্রতকে শাস্তি দেবার ভার আমি নিতে প্রস্তুত, আর এও বলে রাখছি—শোভার স্বামীকে আমিই সায়েস্তা করবো, অবশ্য যদি তোমাদের মত হয়।"

সকলে তার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। কেবল গুলুদি, নীলা আর মায়া মুখ টিপে টিপে হাসছিল। দয়া সেই যে ঘাড় হেঁট করেছে, মাথা তুলে সে আর চাইলে না।

সুব্রত বিস্মিত হয়ে বললেন, "রেণু, তুমি কি তামাসা করছো, না—সত্যি বোলছো?

গুলুদি মুখে রুমাল দিয়ে হাসি চেপে বল্‌লে, "ও সত্যিই বল্‌ছে, দাদা।"

বাহার বিরক্ত হয়ে, মুখ ফিরিয়ে বলে উঠলো, "যত সব বাজে—"

"খবরদার বাহার"—দয়া আবার ঘাড় বেঁকিয়ে তেড়ে উঠল।

গুলুদি তেমনি হেসে বল্‌লেন, "বাহার, দস্যি দয়াকে তুমি বুঝি চেন না?"

দমকা হওয়ার মত সকলের মুখেই হাসি খেলে গেল। কেবল দয়ার রাঙ্গা মুখখানি আরো রাঙ্গা হয়ে রেণুর আঁচলের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো।

ধীরেশ ডাক্তার স্থূল বপুখানি দুলিয়ে কি বলতে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় মায়া আর নীলা এক সঙ্গে বলে উঠলো, "থামুন ধীরেশদা, আর আপনাকে কিছু বলতে হবে না, যা বলবার দাদাই বলবেন।"

তাদের তাড়া খেয়ে ডাক্তার বসে পড়লেন।

কমল বুঝতে পেরেছিল—মেয়েদের তরফ্‌ থেকে একটা ভয়ানক ষড়যন্ত্র চলেছে; বিশেষ, রেণু যখন লীড্‌ নিয়েছে তখন এর পিছনে একটা মত্‌লব আছেই। তাই সে আর কোন উচ্চবাচ্য করেনি।

গুলুদি, নীলা, দয়া, রেণু—এরা ছিল সামনের দিকে, তাদের

পিছনে আরো অনেক মেয়ে বসেছিল। ডাক্তারের অবস্থা দেখে তারা হাসি রুখবার চেষ্টা করলেও, চাপা হাসি মাঝে মাঝে রুমালের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়ছিল। সমিতির মেয়েরা যদিও কেউ ছেলেমানুষ নয়, তবুও স্বভাবে তারা নিতান্তই বালিকা, সেই বালিকা-স্বভাব অনেক সময়েই প্রকাশ হয়ে পড়তো। ধীরেশ তা জানতেন, তাই তাদের হাসিতে মোটেই রাগ করেননি। তবুও সুব্রত একবার মেয়েদের দিকে তাকাতেই তাদের হাসিও মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। তখন তিনি বললেন, "তাই হোক্। রেণু যখন চায়—চিরব্রতের বিচার সেই করুক। আর, মনা দত্তকে সায়েস্তা করা-না-করা তার ইচ্ছে।"

—এ কথায় মেয়েরা খুবই খুসী হোল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সেদিনকার সভার তিন চার দিন পরে কমলকে দিয়ে রেণু চিরব্রতকে ডেকে আনালে। রেণু তাকে শাস্তি দেবার ভার নিয়েছে—এ আগেই বাহারের কাছে শুনেছিল, তাই সে আগুন হয়ে এল। কোন মহিলা-সভ্য কি-না তার শাস্তি বিধান করবে? তাই আবার ঘাড় পেতে তাকে নিতে হবে?

মুখ লাল করে চিরব্রত রেণুর সামনে বসলো। রেণু তখন মুখ টিপে টিপে হাসছিল। তার কাণ্ড দেখে কমলের খুবই আশ্চর্য্য বোধ হোল—সব জিনিসকেই সে এত হাল্কা করে নিচ্ছে কেন?

রেণু তাকে বললে, "কমলদা, দয়াকে একটিবার ডেকে আন না?"

দয়ার নাম শুনেই চিরব্রত ক্ষেপে উঠলো, "কেন, সে এসে কি করবে?"

তার কথার কোন উত্তর না দিয়ে, রেণু ইসারা করে কমলকে যেতে বললে; তখনও তার মুখে সেই দুষ্টুমির হাসি।

দয়া যখন এল, তখন রেণু চিরব্রতের সঙ্গে খুব তর্ক বাধিয়ে দিয়েছে; বলছে, "তুমি ভারি দুর্ব্বল; শোভাকে দেখে কর্ত্তব্য না করে ফিরে আসা তোমার ভাল হয়নি।"

চিরব্রত উত্তর করলে, "শোভা আমার শৈশবের সাথী, আমার বোন, আমি তাকে যা স্নেহ করি, সে আমার মায়ের পেটে জন্মালেও তার চাইতে বেশী করতুম না। তার স্বামীকে অসম্মান আমি কি করে করি বলতো?"

"কর্ত্তব্য,—কর্ত্তব্য; তার ভেতর সম্মান অসম্মান নেই, ভাই।"

রেণুর মুখে এই সব বড় বড় কথা শুনে চিরব্রত বেজায় চটছিল, কিন্তু তখন বেচারী নিরুপায়। দয়া চুপ করে একধারে বসেছিল, সে হঠাৎ রেণুকে জিগেস্ করলে, "শোভার সঙ্গে—একদিন গিয়ে আলাপ করবি?" তারপর চিরব্রতের দিকে ফিরে বল্‌লে, "আমাদের সঙ্গে তোমার বাল্যসখী, না—না খুড়ী, তোমার বোনের ভাব করিয়ে দাও না?"

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চিরব্রত একবার তার দিকে তাকালে। যারা মিঃ দত্তকে শায়েস্তা করবার ভার নিয়েছে, তারাই আবার তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করতে চায় কেন? রেণু টের পেয়েছিল; দয়ার কথায় চিরব্রতের মনে যা সন্দেহ জেগেছে তা ঘুরিয়ে দেবার জন্যে সে বল্‌লে, "ভয় নেই ভাই, শোভাকে আমরা দলে টানবো না। তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।"

"তবে তোমরা তার সঙ্গে ভাব করতে চাও কেন?"

রেণু হেসে বল্‌লে, "সে শুধু তোমার বোন বলে।"

চোখের সামনে যে-চুলগুলি ঝুঁকে পড়েছিল, মাথার ওপর

সেগুলি তুলে দিয়ে, একটু ভেবে নিয়ে চিরব্রত উত্তর করলে, "আচ্ছা, সে দেখা যাবে'খন।"

রেণু তেমনি হেসে বল্‌লে, "দেখা যাবে নয়, আজই তার কাছে নিয়ে চল।"

আশ্চর্য্য হয়ে চিরব্রত জিগেস্ করলে, "আজই ?"

"—এক্ষুণি।"

তার সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখে কমল হেসে বল্‌লে, "রেণুকে তুমি চেন না ভাই, মাথায় যা একবার ঢুকবে, তা ওর তক্ষ্ণি করা চাই-ই।"

"কিন্তু দয়া গিয়ে কি করবে?"—চিরব্রত জিগেস্ করলে।

"ওসব তোমরা বোঝা পড়া কর, আমি ওতে নেই"—কমল জবাব দিলে।

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চিরব্রতের দিকে তাকিয়ে, দয়া ঘাড় নেড়ে বল্‌লে, "আমি যাবই। রেণু যাক, আর নাই যাক।"

সবই বুঝতে পেরে, তবু যেন কিছুই না-বুঝে রেণু চিরব্রতকে জিগেস্ করলে, "তোমার আপত্তি কি ?"

ছবির 'এ্যালবাম্'খানা দেখতে দেখতে সে অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিলে, "আপত্তি আর কি ?—চল তবে।"

দয়া প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। রেণু তাড়াতাড়ি একটুখানি সাজগোজ করে নিলে।

তাদের গাড়ী যখন শোভাদের গেটের ভেতর ঢুকলো তখন বেলা পড়ে এসেছে, উড়ে মালী আঙ্গিনার গাছগুলিতে ঝারীতে করে জল দিচ্ছে। খোকাকে ঝি বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছে। টেনিস-গ্রাউণ্ডে মনা দত্তের বন্ধুরা সবে এসে জমা হয়েছেন।

চিরব্রত রেণুদের নিয়ে ওপরে গেল। গাড়ীর আওয়াজ আর অনেকগুলি পদশব্দ শুনে, শোভা ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। তাকে দেখেই চিরব্রত বল্লে, "তোমার কাছে এঁদের নিয়ে এলুম্ শোভা, আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে। ইনি আমার বন্ধু কমল, ইনি কমলের বন্ধু রেণু, আর ইনি হচ্ছেন রেণুর বন্ধু দয়া। একেবারে মিথ্যে বলি কেন? দয়া আমারও বন্ধু, আমরা এক কলেজে পড়ি।"

শোভা তাদের নমস্কার করলে।

রেণু প্রতিনমস্কার করে বল্লে, "আপনি খুব অবাক হয়ে গিয়েছেন, না শোভাদি? ভাবছেন, মেয়েগুলো কি অসভ্য, জানা নেই, শোনা নেই, একেবারে বাড়ী এসে হাজির।"

দয়া তার কথায় ফোড়ন কেটে, হেসে বল্লে, "তায় আবার কলেজে পড়া—।"

শোভা লজ্জিত হয়ে উত্তর করলে, "ছি ছি, ওকি কথা ভাই?

তা কি মনে করতে পারি?”—এই বলে রেণুর আর দয়ার দুটি হাত ধরে সে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসালে।

কৌচের ওপর তারা বসলো। মাঝখানে শোভা, দু পাশে রেণু আর দয়া, তাদের দুটি হাত তখনো তার মুঠোর ভেতর। সামনের সোফায় বসলো কমল আর চিরব্রত।

খানিকক্ষণ কারুর মুখে কোন কথা নেই; তারপর রেণু বললে, “শোভাদি, আমরা আপনাদের নেমত্তন্ন করতে এসেছি। আসচে রবিবার আমাদের সমিতির অধিবেশন, তাতে আপনারা হবেন প্রধান অতিথি। আপনারা, বিশেষ করে—আপনি সব জিনিষ দেখবেন, শুনবেন, আর অন্যায় কিছু দেখলে আমাদের খুব বকবেন।”

তার কথা শুনে চিরব্রত আর কমল অবাক হয়ে গেল, এসব তো তারা কিছুই জানে না!

কুণ্ঠিত মুখখানি তুলে শোভা উত্তর করলে, “না ভাই, ও আমার দ্বারা হবে না।”

দয়া বললে, “‘হবে না’ কি—শোভাদি? সেদিনকার সভায় ছেলে-মেয়েদের আপনাকেই তো প্রাইজ দিতে হবে।”

আরো লজ্জিত হয়ে, শোভা ঘাড় নেড়ে উত্তর দিলে, “আমায় মেরে ফেললেও আমি পারবো না, ভাই।”

রেণু আর দয়ার মতলব বুঝতে না পারলেও কমল জিগেস্ করলে, “কেন পারবেন না?”

শোভা বল্‌লে, "সভায় যাওয়া আমার অভ্যাস নেই, তায় আবার প্রাইজ দেওয়া।"

রেণু হেসে বল্‌লে, "ছেলে পড়ানও আমাদের অভ্যাস ছিল না, তায় আবার এ, বি, সি।"

চিরব্রত অবাক হয়ে বসেছিল। এরা কেন এসেছে, কি চায়? সে রেণুদের মুখের পানে কেবলি তাকাচ্ছিল—যদি তাদের চোখের ভাষায় কোন কথা ধরা পড়ে যায়!

পাখির ফাঁক দিয়ে এক ঝলক রদ্দুর এসে, শোভার মুখের ওপর পড়েছিল। সে মুখ ভারী সুন্দর, মাতৃত্বের মহিমায়—করুণায় তা যেন পরিপূর্ণ।

রেণুর চুল খোলা ছিল, কবরী বাঁধবার সে সময় পায়নি। তার স্ফুরিত অধরে ঈষৎ হাসি, দুটি চোখে ঈষৎ চঞ্চলতা; মনের অভিসন্ধিকে সে যেন আজ নিবিড় রহস্যে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

দম্ভী দয়া হঠাৎ এত ভাল মানুষ হয়ে উঠেছে কেন? সেও আজ চিরব্রতের কাছে কিছুতেই ধরা দিতে চায় না।

কমলের ক্ষিধে পেয়েছিল, তাড়াতাড়ি কিছুই খেয়ে আসা হয়নি। সে ভাবছিল, শোভা কি বসে কেবল গল্পই করবে, খেতেটেতে দেবে না?

একেবারে চুপ করে থাকা ভাল দেখায় না ভেবে, চিরব্রত শোভাকে জিগেস্ করলে, "মিঃ দত্তকে দেখছিনে কেন?"

"তিনি টেনিসের পোষাক পরছেন। তোমরা বস, আমি ডেকে আনছি।"—এই বলে শোভা উঠে গেল।

সে চলে গেলে রেণু আর দয়া, চিরব্রতের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসতে লাগল, তাই দেখে সে চোখ ফিরিয়ে নিলে।

খানিক পরে স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে শোভা ফিরে এল। তাঁর বগলে টেনিস ব্যাট্, মুখে সিগার; হ্যাট্ খুলে তিনি অতিথিদের অভিবাদন করলেন। রেণুরাও হাতজোড় করে নমস্কার করলে। শোভা তাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে সভায় যাবার কথা পাড়লে—মনা দত্ত, রেণু আর দয়ার পানে এমন ভাবে চাইলেন যাতে অনেক কিছুই বুঝা যায়, তাতে বিস্ময়, বিরক্তি, সংশয়—সবই মেশান ছিল। মুখ থেকে সিগার নামিয়ে, মনের ভাব অসম্ভবরূপে গোপন করে তিনি বললেন "এ তো খুব সৌভাগ্যের কথা, আমরা নিশ্চয় যাব।"

রেণু সহাস্থে উত্তর দিলে, "আজ আমাদেরও পরম সৌভাগ্য, আপনাদের সহায়তা আমরা কিছুতেই ছাড়তে পারিনে।"

তার উত্তরে মনা দত্ত যেন কুণ্ঠিত হয়ে বল্লেন, "কিন্তু আমাদের সহায়তা যে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।"

দয়া বল্লে, "আমাদের কাছে তাই অমূল্য।" আরো খানিক আলাপ করে, বন্ধুরা খেলবার জন্যে তাঁর অপেক্ষা করছেন—এই বলে ক্ষমা চেয়ে মনা দত্ত বিদায় নিলেন।

তারপর চা আর খাবার এল। একটা বড় টেবিলের চারি পাশে আসর জমিয়ে তারা বসলো। রেণুর ফষ্টি নষ্টি তখন চরম সীমায় উঠেছে, নিজেকে কিছুতেই রুখতে না পেরে শোভা তো হেসেই খুন!

চিরব্রতের মনের ওপর যে মেঘ জমেছিল, তা বোধ হয় এই হাসির বাতাসে হাল্কা হয়ে এসেছে; শোভার কানে কানে সে কি বললে। রেণুর দিকে চোখের কোণে একবার চেয়ে নিয়ে, শোভা ইশারায় তার উত্তর দিলে।

খাওয়া শেষ হলে ডিবে থেকে পান তুলে নিয়ে রেণু সহাস্যে জিগেস্ করলে, "চিরব্রত কি বল্‌লে, শোভাদি?"

শোভাও তেমনি হেসে উত্তর দিলে, "ভয় পেয়ো না; বল্‌লে—রেণুর কাছ থেকে গান না-শুনে কখনো ওকে ছেড়ো না।"

"পাগল হয়েছেন, শোভাদি? আমি মোটেই গাইতে পারিনে, ও তাই আমায় জব্দ করতে চায়।"

দয়া বল্‌লে, "মিথ্যে কথা বলিস্ কেন, ভাই?"

ফাঁকি আর চল্‌লো না; রেণুকে গাইতে হোল।

অনেক দিনের কথা; ভাল মনে নেই, তবে গানের ভাবটা এখনও কমলের মনে আছে,—

'তোমাতেই আমার মন গিয়েছে, তাই তো ঘর ছেড়ে বাইরে এসেছি। তোমার চরণে আমার মনকে মগ্ন করে দিয়েছি।

উষার আলো

'হে প্রিয়, আমি তোমার। হে দয়াল, তুমি আমায় দয়া কর। হে ব্যাথার ব্যথী, তুমি আমার নিকটে এস।

'প্রেমে যখন মত্ত হলুম তখন সকলে আমায় বল্লে—পাগল। প্রেমের বেদনা যার বেজেছে সেই জানে।

'আমি তোমার হে স্বামী, প্রসন্ন নয়নে একটুখানি আমার পানে চাও।

'ভিখারিণী তোমার দুয়ারে দাঁড়িয়ে। তুমি ছাড়া কে আর আমায় তৃপ্ত করবে? রাজা, দ্বার খোল—দরশন দাও।'

রেণুর মনের কামনা—কুঁড়ির ভেতর গন্ধের মতই যা এতদিন লুকোনো ছিল—আজ কেন এমন করে সহসা নিজেকে প্রকাশ করে দিলে? এখনও অপরাহ্ণের শেষ রশ্মিটুকু মিলিয়ে যায়নি, এখনও গোধূলির আলো ধূমায়িত আকাশে লেগে রয়েছে, দিবসের আনন্দকে আচ্ছন্ন করে সন্ধ্যার অন্ধকার এখনো নামেনি, এমন সময় কেন সে তার রাজাধিরাজকে দেখবার জন্যে এত উতলা হোল? যার পিপাসায় এই দুর্গম পথে সে যাত্রা করেছে, যার আশায় প্রত্যহের কুশাঙ্কুর তার অকলঙ্ক চরণে অলক্ত পরিয়েছে, সেই অমৃতের সাগর স্বপনের দেবতা ধ্বনিহীন বাণীতে কি তাকে আজ ডেকেছে?

রেণুর সে রূপ ভোলবার নয়! সেই উদাসিনীর মত রাশি রাশি এলায়িত চুল, কোলের ওপর লীলায়িত সেই দুটি যুক্তকর,

উষার আলো

ফুলের মত স্নিগ্ধ মুখে ব্যাকুলতার বেদনা, পদ্মদলের মত দুটি চোখে আকুল-করা চাহনি, এ পৃথিবীর ছবি সে নয়, সে যেন উমা—শিব-পাগলিনী উমা!

নবম পরিচ্ছেদ

রেণু, মিঃ দত্ত ও মিসেস্ দত্তকে সঙ্গে করে সভায় নিয়ে গেল। শোভাকে 'মিসেস্ দত্ত' বললে সে চটে যায়—চিরব্রতের কাছ থেকে এই তত্ত্বটা জেনে নিয়ে রেণু তাকে 'মিসেস্ দত্ত' বলে মাঝে মাঝে ক্ষেপাতো। মাত্র এই কদিনের আলাপ, এরি মধ্যে রেণু তাকে এত আপনার করে নিয়েছে যে, শোভা তার কথায় মোটেই রাগ করে না, বরং সে যেন মনে মনে খুসীই হয়। রেণুর এমন মিষ্টি স্বভাব, সকলে তার সঙ্গে ঝগড়া করেও আমোদ পায়।

গুলুদি, নীলা, মায়া আরো সব মেয়েরা কমলদের সঙ্গে গিয়েছে। চিরব্রত রাগ করে যায়নি। দয়া তাকে অনেক অনুনয় করলে, তবু, ও যখন রাজী হোল না, তখন সে এক রকম টেনে এনেই তাকে গাড়ীতে বসালে।

কলকাতা পার হয়ে, তারা পাড়াগাঁয় এসে পড়লো। দুপাশে খোলা মাঠ, ধানের ওপর শরতের বাতাস, কাদা ঘেঁটে কালো কালো মেয়েরা মাছ ধরছে, তাই দেখে দয়ার অনেক দিনের কথা মনে পড়ে গেল,—ছেলেবেলায় একবার

যখন দেশে গিয়েছিল, সেও তখন তাদের ঝির সঙ্গে ধানের ক্ষেতে পালিয়ে গিয়ে এমনি করে কতদিন মাছ ধরেছে, কাদার সেই সোঁদালী গন্ধ এখনও তার নাকে যেন লেগে রয়েছে।

একটা গাঁয়ের শেষে এসে তারা দেখলে, গাছের নীচে ভিঁড় করে কতকগুলি লোক দাঁড়িয়ে; তাদের ভেতর কে যেন কাঁদছে।

দয়া চিরব্রতকে বল্‌লে, "দেখে এস না ভাই, কার কি হয়েছে?"

সে নেমে গিয়ে খোঁজ করে এসে জানালে, "একটি মেয়ে—বোধ হয় ভিখিরী,—ছেলেটি তার মর-মর।" তারপর বল্‌লে, "গাড়ীতে ওদের তুলে নিয়ে গেলে হয়।"

খুব উৎসাহের সঙ্গে দয়া উত্তর দিলে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিয়ে চল।"

"তারপর কি হবে?"

"কেন, আমরা দেখবো" বেদনায় দয়ার গলা ভারী হয়ে এল।

চিরব্রতের সঙ্গে সেও নামলো। এসে দেখলে—ছসাত বছরের একটি মরণাপন্ন ছেলে কোলে করে, মা আকুলি-বিকুলি হয়ে কাঁদছে। দয়াও কেঁদে ফেল্‌লে।

সকলে ধরাধরি করে ছেলেটিকে গাড়ীতে তুল্‌লে। তার পাশে একটুখানি জায়গা করে দয়া বসলো, মা বসলো নীচে, চিরব্রত

ড্রাইভারের কাছে ঠাঁই করে নিলে। হর্ণ বাজিয়ে গাড়ী ছাড়তেই দয়ার পা দুটি জড়িয়ে মেয়েটি কেঁদে উঠলো,—"তোমার স্বামী চিরজীবী হোক মা, বাছাকে আমার বাঁচিয়ে দাও।" তার বাহুবন্ধন হতে নিজেকে মুক্ত করে, লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে দয়া বসে রইলো। এই সহৃদয় ভদ্রলোক তার স্বামী নয়—সহপাঠী মাত্র, বারংবার এ কথা বলতে চাইলেও কিছুতেই তার মুখ দিয়ে বের হোল না। তার সিঁথীতে সিঁদুর নেই—এও কি সে দেখেনি? বাইরের দিকে মুখ করে দয়া বসে রইলো, যদি সে আরো লজ্জাকর কিছু জিগেস্ করে বসে?

*   *

চিরব্রতরা বাঁধের কাছে এসে নামলো। সামনেই মায়াপুরের গঙ্গা। দয়া এক রকম ছুটে গিয়েই বাঁধের ওপর উঠলো। তখন পূর্ণ জোয়ার। অনেক দূরে—দৃষ্টির শেষ সীমায় আকাশ আর জল একাকার হয়ে গিয়েছে। কত নৌকো পাখীর মত ডানা মেলে উড়ে চলেছে। হুহু করে বাতাস এসে দয়াকে যেন ভাসিয়ে নে'যেতে চায়! চোখের ওপর থেকে চূর্ণ চুলগুলি সরিয়ে, ছবির মত সে অপলক নয়নে গৈরিক জলোচ্ছ্বাসের এই অনন্ত বিলাস প্রাণভরে দেখতে লাগলো; একদিকে—নীল বনরেখা মাটীর বুকে নিঃশেষে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে, অন্যদিকে—রূপনারায়ণ তার বিপুল জলসম্ভার

নিয়ে গঙ্গার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, মধ্যে—তরঙ্গে তরঙ্গে কী আবর্ত্ত, কী কোলাহল!

চিরব্রত বল্‌লে, "চল শীগ্‌গীর, আমায় তো নিয়ে এলে—ওদিকে সভা যে শেষ হয়ে এল।"

"যাচ্ছি"—বলে দয়া তেমনি দাঁড়িয়ে রইলো।

আসবার নাম নেই দেখে, চিরব্রত এবার বেশ জোর করেই বল্‌লে, "এস, একেবারে যে তন্ময় হয়ে গেলে।"

সে ঠিকই বলেছিল। তারা যখন এল তখন সভার কাজ অনেক এগিয়ে গিয়েছে। বহু লোক; চাষাভুষোই বেশী। সমিতির বিদ্যালয়ের, শিল্প-মন্দিরের, ব্রতী বালকদের, পুরচারিণী-গণের শত শত ছেলেমেয়ে এসেছে। বামুন, কায়েত, তেলী, মালী, সকল বর্ণের কর্ম্মীরাই সমবেত। সভার একদিকে—বই, খাতা, লাঙ্গল, গরু, ছাগল, হাতুড়ী, বাটালি, কোদাল, কুড়ুল, মোটা তাঁতের কাপড় স্তরে স্তরে সাজান—সভা শেষ হয়ে গেলে বিতরণ হবে; মাঝখানে—আলপনা দেওয়া বেদীতে পূর্ণ ঘট, তার ওপর গোছা গোছা পদ্মফুল। পাড়াগেঁয়ে মেয়েরাও ঘোমটা টেনে সুব্রতর বক্তৃতা শুনছে,—

"সকলের কাছে আমার নিবেদন, তাঁরা আমাদের সামান্য অধিকার দিন্; অধিকার—সেবার, পূজার, ভালবাসার। অসুখ বিসুখে তাঁদের পাশে আমরা বসতে চাই, তাঁদের জমি আমরা

চষতে চাই, তাঁদের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে চাই, তাঁদের সুখে দুঃখে হাসতে চাই, কাঁদতে চাই।"

তারপর সভ্যগণের দিকে ফিরে তিনি বল্‌লেন, "আমাদের কর্ম্মে, আমাদের ধর্ম্মে, আমাদের ব্রতচারীর ভেতর উচ্ছৃঙ্খলতার স্থান নেই। নিজেকে নিমিত্ত বলে যে ভাবে না, কর্ম্মকে পূজা বলে যে মানে না, যার মন বাসনা-কামনায় পঙ্কিল, সুখ-লালসায় যে কাতর, এমন যদি কেউ আমাদের ভেতর থাকে, আমার করজোড়ে অনুরোধ—সে চলে যাক্, তার স্থান অন্যত্র। আমাদের নেতা কেউ নেই; যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, যাঁর লীলা-বিলাসে অগণন চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবী উঠছে ডুবছে ভাসছে—তিনিই আমাদের নেতা। তিনি প্রতি রূপে, প্রতি বর্ণে, সৃষ্টির প্রতি তরঙ্গে, প্রলয়ের প্রতি আবর্ত্তে; তাঁরি পূজারী আমরা, মানব-বিগ্রহে তাঁরি আমরা অর্চ্চনা করি। তিনি যদি খুসী হন, সেই আমাদের স্বর্গ—সেই আমাদের মোক্ষ।

"এই গেল আমাদের আদর্শ ও ভাবের কথা, এর পর বলি কাজের কথা। কোন কাজকেই আমরা ছোট ও অনাবশ্যক বলে ভাবি না। তাঁত বোনা, মাটি কোপান, জমি চষা, মাষ্টারী, কেরাণীগিরি, ওকালতি, জজীয়তী, দাঁড়টানা, ইঞ্জিন চালান—সব কাজেরই প্রয়োজনীয়তা আমরা মানি। তাই—তাঁত, কোদাল, লাঙ্গল, মিল্, ফ্যাক্টরী, ষ্টীমার, নৌকো, গরুর গাড়ী—কোন

জিনিষকেই আমরা অ-কেজো বলে ফেলে দিতে চাই নে। তবে যার সার্থকতা বেশী, যা সময় উপযোগী তাই টেঁকে থাকবে, বাকী সব আপনিই বাতিল হয়ে যাবে। সেইজন্যে ছেলে-মেয়েদের সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যার যেমন শক্তি তাকে অল্পবিস্তর আমরা অন্য জিনিষও শেখাই। মাথা ভারি ঠুঁটো জগন্নাথ না-গড়ে, হাত-পা-ওয়ালা ঘটে বুদ্ধি আছে—এমনি মানুষ আমরা তৈরী করতে চাই। জগন্নাথ মন্দিরে থাকুন, আমরা তাঁর ভোগ চড়াব, কিন্তু কাজ করবো এই মানুষ-ভগবান নিয়ে, মানুষ-ভগবানেরই ভেতরে।

"আবার কিন্তু আদর্শের কথা এসে পড়লো। মানুষকে আমরা ভগবান বলে বিশ্বাস করি বলেই তার দুর্ব্বলতা স্বীকার করিনে। তবে মানুষের যে-দুর্ব্বলতা আমরা দুচোখ ভরে দেখি, তা দুর্ব্বলতা নয়, মিথ্যা সংস্কার-প্রসূত প্রহেলিকা মাত্র। মানুষ জন্মাতে-না-জন্মাতেই বহু অতীত কাল হোতে সঞ্চিত কতকগুলো সামাজিক সংস্কার তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়, সেই সংস্কারগুলোর আবার বেশীর ভাগেরই জন্ম—ভুল ধারণা থেকে, দেশ-কালের সীমার মধ্যে; সেই সংস্কারের আবহাওয়া সে কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারে না। মানুষকে যদি সংস্কারমুক্ত কোরে,—'সে ভগবান, সে নিষ্পাপ'—এই সত্যের ওপর তাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তবে নতুন সমাজ গড়বে,

নতুন সংস্কারও উঠবে, দুর্ব্বলতা বা পাপ বলে যেখানে কোন কথাই থাকবে না, আর আমার বিশ্বাস—দুঃখের পরিমাণও অনেক কমবে। যতই দিন যাচ্ছে, মানব-সমাজ ততই জটিল হয়ে পড়ছে, তার দুঃখও তত বেড়ে চলেছে, সেই জটিলতা আর দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি না-পেয়ে সে যেন হাঁপিয়ে উঠছে। এমন শক্তিমান মানুষ চাই, অথবা ভগবানের এমন প্রচণ্ড শক্তি মানুষের ভেতর লীলায়িত হওয়া প্রয়োজন—যা সর্ব্বত্রই আমূল পরিবর্ত্তন আনবে।"

দশম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা হয়-হয়। রেণু আর নীলা গাড়ী থেকে নেমে গলির ভেতর ঢুকলো, সঙ্গে কমল। গলিটা এঁদো পুকুরের সামনে এসে শেষ হয়েছে। তার চারিদিকে ছোট ছোট খোলার ঘর, আসে পাশে রাশীকৃত ময়লা, নর্দ্দমা পচে ভ্যাট্ ভ্যাট্ করছে। নানা লোকের বাস সেখানে—উড়ে ঠাকুর, বেহারী গাড়োয়ান, ছুতোর, মিস্ত্রী, স্ত্রীপুরুষ নানা রকমের। অতগুলি লোকের জন্যে একটা জলের কল, একটি মাত্র পায়খানা। অতি ঘন ধোঁয়ায় সমস্ত পাড়া আচ্ছন্ন। এমন কদর্য্য স্থানে কমলের সঙ্গে রেণুদের আসতে দেখে লোকগুলো অবাক হয়ে গেল, ভদ্রমহিলাদের যে এখানে কখনো কোন কারণে আসা সম্ভব—এ তাদের কল্পনারও অতীত। সকলে সম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিলে, কেউ কেউ মাথা নীচু করে প্রণাম করলে, সব চেয়ে তারা আশ্চর্য্য হোল যখন রেণুরা সেই বিশ্রী ঘরগুলোরই একটার দাওয়ায় গিয়ে উঠলো।

"দাদা"—নীলা ডাকলে।

একটি লোক অন্ধকার ঘরের ভেতর থেকে গুড়িসুড়ি মেরে বেরিয়ে এল। এত নীচু যে, সোজা হয়ে দাঁড়ালে মাথা ঠেকে।

"কি, তোমরা যে?" একমুখ হেসে সুব্রত জিগেস্ করলেন।

রেণু উত্তর দিলে, "কয়েক দিন কোন খবর পাইনি, তাই দেখতে এলুম।"

"দাদা মরেছে, কি বেঁচে আছে—? তা বেশ করেছো"—এই বলে সুব্রত তাদের ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না; কী মশা, যেন ছিঁড়ে ফেলতে চায়! বাতি জ্বালাবার পর ঘরের ভেতরটা স্পষ্ট হোল; যাতে না 'ড্যাম্প' ওঠে, তাই মেজেতে হোগ্‌লা দিয়ে 'ম্যাটিং' করা হয়েছে, তার ওপর দুতিনখানা কম্বলে সুব্রতর শয্যা, বালিশের বালাই নেই।

"কি করছিলেন?"—রেণু জিগেস্ করলে।

ঠিক সেই সময় একটি ছেলে ঠোঙ্গায় করে মুড়ি নিয়ে এসে তাঁকে দিলে। সুব্রত বল্‌লেন, "বেচু, দিদিদের নমস্কার কর্।" চৌকাঠে মাথা ঠেকিয়ে সে প্রণাম করলে। বয়স তার পনের ষোলর বেশী হবে না; দিব্যি শ্যামল সুঠাম বলিষ্ঠ দেহ। সে চলে যেতে তিনি বল্‌লেন, "ওরা মুদি, মুড়ির দোকান করে; বেচুর বাবা রোজ আমায় এক ঠোঙ্গা করে মুড়ি পাঠিয়ে দেয়, এই 'রো' টার পরের 'রো'-এ একটা টিনের ঘরে তারা থাকে। বেশ টাট্‌কা গরম মুড়ি—খাবে?" তাদের উত্তরের অপেক্ষা না করেই কতকগুলো মুড়ি রেণুর আঁচলে ঢেলে দিয়ে সুব্রত বল্‌লেন, "খাও।"

এক মুঠো মুড়ি মুখে দিয়ে রেণু জিগেস্ করলে, "দাদা, এই ঘরে আর এমনি জায়গায় কি করে আপনি থাকেন ?"

"থাকতে হয়, রেণু।"

নীলা বল্লে, "কেন ?"

কমল চটেমটে জবাব দিলে, "খাচ্ছিস্ খা, কেন মিছে ওঁকে জ্বালাতন করিস্ ?"

"না না, জ্বালাতন আর কি ?" তারপর নীলার দিকে চেয়ে সুব্রত বল্লেন, "তোমরা কার সেবা করতে চাও, দিদি ? বড় লোকের, না গরীবের ?—নিশ্চয়ই গরীবদের। গরীবের অভাব দূর করতে হোলে তাদের দারিদ্র্যের, তাদের দুঃখের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হওয়া চাই। পড়ে শুনে নয়, পরিচয় চাই অনুভূতি দিয়ে। তোমরা যে-ঘরে জন্মেছ, সেখানে থেকে, দরিদ্রের বেদনা কি তা তো বুঝতে পার না, নীলা। এখানে আসবার, আর এই জীবন নেবার আগে আমিই কি ছাই জানতুম ? শিক্ষার অভাবে, অর্থের অনাটনে, জঘন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থায় এই লোকগুলো পশু হয়ে যাচ্ছে। পশুর মত খাটে, আর পশুর মতই জীবন কাটায়। তোমরা বল, দেশের গরীবরা ন্যায়পরায়ণ, ধর্ম্মভীরু; হয় তো একসময় তাই ছিল, পাড়াগাঁয়ে হয় তো এখনও কিছু আছে, কিন্তু কলকাতার এই লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবীর ভেতর কজন ন্যায়পরায়ণ, ধর্ম্মভীরু

আছে বল্‌তে পার? শিক্ষিত ভদ্রলোকের ভেতরই বা কজন আছেন? থাক্, ভদ্রলোকদের কথা আর তুলবো না, তাঁরা আমাদের আলোচনার বাইরে। বস্তীগুলোর ভেতর গিয়ে, মিলের কুলিরা যেখানে থাকে—সেই সব 'ব্যারাকে' গিয়ে তাদের পারিবারিক জীবন অনুসন্ধান কর, দেখবে, সেখানে বৈধ অবৈধ বলে কোন জিনিষই নেই। কেন নেই,—জান? সহরে দুপয়সা বেশী পায় বলে গরীব শ্রমিকেরা এখানে আসে। হাড় ভাঙ্গা খেটেও যা রোজগার করে তাতে তাদের স্ত্রীপুত্র সহরে রাখা চলে না। একাই তারা থাকে—কখনো কেমনো দেশে যায়। কিন্তু স্বভাবের ধর্ম্ম কি করে এড়াবে বল, রেণু? সে শিক্ষা তো তাদের নেই। সমাজের একটা বিরাট অংশ এমনি করেই পাকে চক্রে দিনদিন মরতে বসেছে, কেউ তাদের কথা ভাবে না, ফিরেও তাদিকে কেউ দেখে না। তোমাদের দেবতা, নীলা, তোমাদের নারায়ণ, তোমাদেরই পূজো পাবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তোমরা শিক্ষা দিয়ে তাঁদের সেবা কর,—ধন্য হও।"

চখের জল অতি কষ্টে নিবারণ করে রেণু বল্‌লে, "দাদা, চির জীবন ধরে আমরা এদেরই পূজো করবো।"

"তাই কর বোন্, তাই কর।"

"কিন্তু দাদা, আপনার একদণ্ডও আর এখানে থাকা চলবে না—" অনুযোগের সুরে নীলা এই কথা বল্‌লে।

"কেন ?"—যেন আশ্চর্য্য হোয়ে সুব্রত জিগেস্ করলেন।

নীলা উত্তর দিলে, "এখানে থাকলে কি মানুষ বাঁচে ? এত 'ড্যাম্প' যে দেয়াল পর্য্যন্ত ভিজে রয়েছে ; অন্ধকার, বাতাস নেই, চারিদিকে পচা ড্রেণের দুর্গন্ধ, কোথায় খান—কি খান তার ঠিক নেই ;—না দাদা, আপনার পায়ে পড়ি এখানে আর থাকবেন না।"

সুব্রত প্রশান্ত মুখে বল্লেন, "তোমরা বুঝি আমায় রাজার হালে রাখতে চাও, নীলা ? না বোন্, তা হবে না। আমি এদের ছেড়ে যেতে পারবো না। যদি এরা বাঁচে, আমিও বেঁচে থাকবো, ভয় কি ? যতই খারাপ হোক্—এরা তো আমারই ভাই-বোন্, এদের এই অবস্থায় রেখে আমি কি করে যাই বল তো ? যদি সম্ভব হোত, নীলা, তোমাদেরও এখানে রেখে দিতুম,—দেখাতুম, কি শোচনীয় অবস্থায় এরা পড়ে আছে। সমাজের একটা বিরাট্ অংশের সঙ্গে তোমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় করিয়ে দিতুম।"

রেণু বল্লে, "বেশ তো, মাঝে মাঝে এসে থাকবেন।"

"আচ্ছা দাদা, আপনি থাকেন তো এই কুঁড়ে ঘরে, কিন্তু মাঝে মাঝে ভাল পোষাক টোষাক যে পরেন সে সব পান কোথায় ?" কৌতুহলী হয়ে নীলা জিগেস্ করলে।

এই প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু নীলা বরাবরই এই রকমের।

কথার মাঝখানে ছেলেমানুষের মত যা তা খাপছাড়া জিগেস্ করে বসে।

সুব্রত হেসে বল্‌লেন, "ছেঁড়া কাপড় জামা পরে তো আর সব জায়গায় যাওয়া যায় না, তাই ওসব কিছু কিছু রাখতে হয়, বোন্।" তারপর কমলের দিকে তাকিয়ে জিগেস্ করলেন, "কি করা যায় বল তো? জামালপুরের হাঙ্গামার পর পূর্ব্ব-বাংলার সব মুসলমানই ক্ষেপে উঠেছে। মৈমন-সিংয়ের একটা পাড়াগাঁয়ে সমিতির স্কুল আছে। মুসলমানেরা সেটা পুড়িয়ে দিতে চায়, দু একবার চেষ্টাও করেছে। এমনি করে ঝগড়া ঝাটি করলে কি করে চলে বল তো? এমন কেউ নেই যে, তাদের গিয়ে থামিয়ে দিয়ে আসে। আমি একা সব পেরে উঠি নে, ভাই।"

রেণু উৎসাহের সঙ্গে বল্‌লে, "আমি যাব, দাদা।"

নীলা বল্‌লে, "আমিও যাব, আপনার দুটি পায়ে পড়ি।"

"তোমরা ক্ষেপে গেলে নাকি? কি বলছো সব!"

"কেন?" রেণু জিগেস্ করলে।

সুব্রত বল্‌লেন, "তোমাদের, সেই রাক্ষস-পুরীতে পাঠিয়ে আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি?"

রেণু উত্তর দিলে, "কোন ভয় নেই আপনার, আমাদের ছেড়ে দিন।"

"আচ্ছা সে দেখা যাবে, কিন্তু তোমরা কেন এসেছ আগে তাই বল ?" তিনি হাসিমুখে জিগেস্ করলেন।

রেণু পাঁচ হাজার টাকার একখানি চেক্ তাঁর হাতে দিয়ে বল্লে, "সেদিনকার সভায় গিয়ে মিঃ দত্ত খুব খুসী হয়েছেন। সমিতির কাজের জন্যে তিনি এই চেক্‌টা আজ আমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

চেক্‌খানা কম্বলের নীচে গুঁজে রেখে সুব্রত পরিহাস করে বল্লেন, "এ তো হোল মিঃ দত্তের আক্কেল সেলামী। কিন্তু চিরব্রতের কি ব্যবস্থা করলে ? তার শাস্তিটা কি মাঠে মারা যাবে ?"

রেণু হেসে উত্তর দিলে, "আপনি থাকতে কারু কি ফাঁকি দেবার যো আছে, দাদা ?"

সুব্রতর মুখ দেখা গেল না, তাড়াতাড়ি আলোটা নিবিয়ে দিয়ে বল্লেন, "চল, এবার তোমাদের রেখে আসি।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

বিকেলের ট্রেণে নেমে, দুটি ছেলে ষ্টেশনের বাইরে এসে নৌকোয় উঠলো। কী সুশ্রী, কচি মুখে কী অপরিসীম লাবণ্য! সাহেবী পোষাক, হিন্দীতে কথা বলছে, মাঝে মাঝে ইংরেজী বুক্‌নি। ছোট্ট একখানি পান্সি নিয়ে সন্ধ্যার আগেই তারা ভাসলো। নদীও খুব বড় নয়। পূর্ব্ব-বঙ্গে তারা এই প্রথম এসেছে। আহা কী সুন্দর,—কী সজল মাঠ, কী শ্যামল গাছ! আকাশ এখানে কী নীল, বাতাস এখানে কী মধুর! ঘাট থেকে মেয়েরা জল নিয়ে যাচ্ছে, তাদের হাস্য পরিহাসে পল্লীবাট মুখরিত। কাদামাখা কালো কালো ছেলেদের কী সুঠাম ভঙ্গি! নয়নভোলানো—মনহারানো ধানের ক্ষেত,—যোজনব্যাপী দিগন্ত-প্রসারী।

নদীর স্রোতে ভেসে ভেসে, নৌকো বেয়ে, গান গেয়ে তারা আনন্দ করে চলেছে। পিছনের আলো ছাপিয়ে, তাদের সামনে অন্ধকার ঝাঁপিয়ে এল। আসে পাশে চারিদিকে জোনাকি ফুটে উঠলো। সুপুরিগাছগুলি নারিকেল-বীথির সঙ্গে এই সন্ধ্যার অন্ধকারে চুপি চুপি যেন মিতালি করছে।

ঘণ্টা দুই পরে নৌকো এসে গ্রামের ঘাটে লাগলো। কয়েকটি ভদ্রলোক সেখানে অপেক্ষা করছিলেন, তাঁরা ছেলে দুটিকে নামিয়ে নিলেন। সুরকী ঢালা লাল রাস্তা বড় গেটের সামনে শেষ হয়েছে। তারপরেই বাগানের মাঝখানে প্রসাদ-তুল্য বাড়ী—লোকজনে পরিপূর্ণ। বাড়ীখানি এক মুসলমান জমিদারের, এ অঞ্চলে তিনি নবাব সাহেব বলেই পরিচিত। নবাব সাহেবের ছেলে রহমতুল্লা অতিথিদের অভ্যর্থনা করে বাইরের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। তারা আগের থেকে চিঠি দিয়ে এসেছে, বন্দোবস্ত সবই ঠিক ছিল। বেহারের লোক তারা, বাংলা দেশ দেখতে বেরিয়েছে। সেদিন বেশী কথাবার্ত্তা হোল না, খেয়ে দেয়ে সকাল সকাল ঘুমোতে গেল।

পরদিন সকাল বেলা নবাব সাহেব ছেলে দুটির সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ঠিক যেন পয়গম্বর। পাকা আমের মত টুকটুকে মুখ, দুধের মত সাদা চুল, আবক্ষলম্বিত শ্বেত শ্মশ্রু হাওয়ায় ফুর্ ফুর্ করে উড়ছে ;—তিনি এসেই ছেলেদের অভিবাদন করলেন। তারাও প্রতিনমস্কার করে হাত ধরে তাঁকে একটা কৌচের উপর বসিয়ে, নিজেরাও চেয়ার নিয়ে তাঁর সামনে বসলো।

দাড়িতে হাত বুলিয়ে নবাব সাহেব তাঁর ফিরিঙ্গী ম্যানেজারকে বললেন, "আমি ভেবেছিলুম এঁরা খুব বয়স্ক

লোক, কিন্তু এ যে দেখছি একেবারে ছেলেমানুষ, আমার রহমতের মত।”

ছেলেরা হেসে উত্তর দিলে, “মনে করুন না আপনার রহমতই আমরা।”

বৃদ্ধ মনে মনে খুব খুসী হলেন।

ম্যানেজার জিগেস্ করলেন, “শিখদের মত আপনারা এমন জব্বর পাগড়ী পরেন কেন?”

ছেলেরা বল্লে, “লাহোরে আমরা অনেকদিন ছিলুম, সেখানে থেকে অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।”

“পাঞ্জাবে হিঁদুরা কি খুব প্রবল?”

“মোটেই না। তবে সেখানে হিঁদু-মুসলমানে এখনও খুব সদ্ভাব।”

নবাব সাহেব বল্লেন, “আমাদের বাংলা দেশে কিন্তু বড়ই গোলমাল আরম্ভ হয়েছে। এর জন্যে দায়ী কিন্তু হিঁদুরা, ভারি মতলব্বাজ তারা। তাদের আর মোটেই বিশ্বাস করা চলে না।”

ছেলেরা উত্তর দিলে, “তা তো দেখছি। কিন্তু এতে কি খুব ভাল হবে? হিঁদু-মুসলমান উভয়েরই তো এতে ক্ষতি।”

“তা ঠিক, কিন্তু আমাদের স্বার্থে ঘা পড়লে আমরা কি চুপ করে থাকবো?”

“তা তো বলছিনে, তবে পাশাপাশি বাস করতে গেলে

একের স্বার্থে অন্যের যাতে বিশেষ ক্ষতি না হয়—সেটাও তো দেখতে হবে? আর, মাপ করবেন নবাবজাদা, আপনি যে বল্‌লেন—হিঁদুরা ভারি মতলব্‌বাজ, কিন্তু মুসলমানদের এ পর্য্যন্ত তারা কি অনিষ্ট করেছে? অনেক হিঁদু ছেলে আমাদের দোস্ত, তাদের মত উদার মহাপ্রাণ তো আমাদের সমাজে খুব কমই আছে। তাদের কিন্তু আমরা মোটেই অবিশ্বাস করতে পারি নে, নবাব সাহেব।"

"হ্যাঁ, তা ঠিক; ভালমন্দ দুই-ই আছে।" তিনি ঈষৎ লজ্জিত হয়ে উত্তর করলেন।

ছেলেরা তেমনি মুক্তকণ্ঠে বলে গেল, "আর সেদিন আপনাদেরই এখানে মুসলমান গুণ্ডারা কি করলে বলুন তো? হিঁদুদের প্রতিমা ভাঙ্গলে, মেয়েরা অপমানিত হোল,—তাদের কুকাজের জন্যে আজ সমস্ত মুসলমান সমাজ লজ্জায় মাথা তুলতে পারছে না।"

ফিরিঙ্গী ম্যানেজার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার ছেলেদের দিকে চাইলেন, সে দৃষ্টি সন্দেহপূর্ণ।

নবাব সাহেব যেন ক্ষুণ্ণ হয়ে বল্‌লেন, "আমরা কিন্তু ওসবের কিছুই জানি নে।"

"ছিঃ ছিঃ, তাকি আমরা বলছি; আপনি অতি মহৎ, আপনার কাছে হিঁদু-মুসলমান দুই-ই সমান।"

প্রসন্ন ও প্রচ্ছন্ন হাসিতে নবাব সাহেবের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

কাইজারের মত বড় বড় গোঁফে চাড়া দিয়ে ম্যানেজার বল্‌লেন, "আমাদের ষ্টেটে বিশেষ কোন গোলমাল নেই। এখানকার স্কুল নিয়ে সম্প্রতি যা একটু মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়েছে।"

নবাব সাহেব বল্‌লেন, "অশিক্ষিত লোক, বোঝালেও বোঝে না, ভারি মুস্কিল; তারা বলে—হিঁদুদের স্কুলে আমরা পড়বো না।"

ছেলেরা উত্তর দিলে, "সেইজন্যেই তো শিক্ষার প্রয়োজন, নবাবজাদা। বিদ্যায় কি আর জাতিভেদ আছে? হিঁদু-মুসলমান সকলের কাছেই তা অর্জ্জন করা যেতে পারে—কারুই তাতে আত্মসম্মানের লাঘব হয় না। বিদ্যার গৌরব সমস্ত অগৌরবকেই যে ঝড়ের মত উড়িয়ে নে' যায়।"

বৃদ্ধ নবাব দীর্ঘ দাড়ির ভিতর আঙ্গুল চালাতে চালাতে বল্‌লেন, "আপনাদের কথাগুলি বেশ যুক্তিপূর্ণ। আপনারা যদি সকলকে ডেকে একদিন বুঝিয়ে দেন তা হলে খুব ভাল হয়।"

ছেলেরা লজ্জিত হোল। "আমরা আর কি-ই বা জানি? আপনারাই ভাল করে বলে দেবেন।"

বাবুর্চ্চি, চা ডিম আর টোষ্ট নিয়ে এল। তাদের নিয়ে

নবাব সাহেব খেতে বসলেন। চায়ের বাটীতে এক চুমুক দিয়ে ম্যানেজার জিগেস্ করলেন, "আপনারা কত দেশ বেড়িয়েছেন ?"

"কিছুই না, কেবল পঞ্জাবটা দেখেছি—পেশোয়ার পর্য্যন্ত। এবার বাংলা মুল্লুক বেড়িয়ে বম্বের দিকে যাব।"

রহমতুল্লা এসে ঘরে ঢুকলেন। বেড়াতে যাবার জন্যে তিনি ছেলেদের ডাকতে এসেছেন। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে তারা ঘোড়ার পিঠে গিয়ে বসলো।

* *

কেন জানি না, ছেলে দুটিকে নবাব সাহেবের বড্ডই ভাল লেগেছিল। সকাল সন্ধ্যে খানিকটা সময় তিনি তাদের সঙ্গে প্রায়ই গল্পগুজব করে কাটাতেন। রহমতুল্লা হয়ে উঠেছিলেন তাদের একেবারে পেয়ার, রাত্তিরটা ছাড়া সব সময়ই তিনি সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন। একদিন তারা নবাব সাহেবকে ধরে বসলো—গ্রামের স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে ; তাঁরা নাকি মাইনে না নিয়ে, খুব যত্ন করে ছেলেদের পড়ান। ঠিক সেই সময় প্রধান শিক্ষকের বিদায় উপলক্ষে স্কুলে যে সভা বসবে—তাতে নবাব সাহেবের নিমন্ত্রণ এল সভাপতি হবার জন্যে ;—তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। তাঁর মুসলমান প্রজারাও এতে খুসী হোল। স্কুলের সঙ্গে একদল লোকের যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়েছিল

এমনি করে তা যখন মিলনমুখী হয়ে এসেছে, তখন নবাব সাহেব একদিন উভয় পক্ষকে ডেকে মিটিয়ে দিলেন। অল্পবয়স্ক দুটি যুবকের প্রচ্ছন্ন চেষ্টা, আন্তরিকতা ও চতুরতায় বাংলাদেশের একাংশে হিঁদুমুসলমান-ঝগড়ায় এইরূপে যবনিকা পড়লো।

দিনগুলি বেশ আনন্দেই কেটে যাচ্ছে। কিন্তু পোলাও কালিয়া খেয়ে, ঘোড়ায় চড়ে, আর শীকার খেলে তো পরের বাড়ীতে বেশী দিন থাকা যায় না, কাজেই ছেলেদের যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে হোল। তাদের যাবার কথাতে নবাব সাহেব মুখ ভার করলেন, রহমতের চোখ সজল হয়ে এল; স্নেহ এমনি জিনিষ—পরকেও কত সহজেই না আপনার করে ফেলে!

যাওয়া তাদের হোল না। কয়েকদিন পরে নবাব সাহেব অসুখে পড়লেন, বুড়ো মানুষ—ঠাণ্ডা লেগে সর্দ্দিজ্বর হয়েছে। সামান্য জ্বর—অল্পেই সেরে উঠবেন—এই ছিল সকলের আশা—কিন্তু শেষে তা নিমোনিয়ায় দাঁড়ালো। হাকিম সাহেব চিন্তিত হলেন—বৃদ্ধ বয়সে এই ধাক্কা সামলাতে পারবেন কি? অসুখ বাড়বার পর থেকে রহমতের খুব কমই দেখা পাওয়া যেত। তিনি বেশীর ভাগ সময় বাবার কাছেই থাকতেন। ছেলেরাও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো; কোন প্রিয়জনের অসুখে,

বিশেষে প্রাণ যেখানে সংশয়াকুল, সেখানে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা—তাদের কোষ্ঠিতে কখনও লেখেনি।

*   *

এই বিপদের মধ্যে একদিনের এক অভাবনীয় ঘটনায় নবাব বাড়ীর সকলে অবাক হয়ে গেলেন। তাঁরা দেখলেন, ছুটি সুশ্রী তরুণী গোধূলির ধূসর আলোকে সেই ছুটি ছেলের নির্দ্দিষ্ট আবাস থেকে বেরিয়ে এসে, স্মিত হাস্যে ধীরে ধীরে নবাবের অন্দরে প্রবেশ করলে। কেউ তাদের কখনও দেখেনি, তবুও তারা খুবই পরিচিতের মত বিনা আহ্বানে, বিনা সঙ্কোচে, বিনা দ্বিধায় একেবারে অন্দর মহলে গিয়ে হাজির।

তারা জিগেস্ করলে, "নবাব সাহেব কেমন আছেন ?"

নবাবের মেয়ে সখিনা বল্‌লে, "আপনারা কি তাঁকে চেনেন ?"

"চিনি—" তারা ঈষৎ হেসে উত্তর দিলে, "আমরা তাঁকে একবার দেখতে চাই, শুনলুম—তাঁর খুব অসুখ।" একটু থেমে জিগেস্ করলে, "এখন দেখা হবে কি ?"

সখিনা বল্‌লে "হবে। কিন্তু— আপনারা কোথায় থাকেন ?"

"এখানেই—"

"এখানেই ? মানে— ?"

"এই বাড়ীতেই।"

"এই বাড়ীতেই?" সখিনা অবাক হয়ে গেল। এ কি কথা? এই বাড়ীতে কোথায় তাঁরা থাকেন? কবে থেকে? কিছুই বুঝিতে না পেরে তাঁদের মুখের দিকে সে তাকিয়ে রইলো।

তার অবস্থা দেখে মেয়েদের খুবই হাসি পাচ্ছিল। কোন রকমে হাসি চেপে তারা বল্‌লে, "আপনার বাবার কাছে আমাদের নিয়ে চলুন।"

সখিনা তাদের নিয়ে গেল। সমস্ত দোর্ জানালায় সবুজ রংয়ের পুরু পর্দ্দা, ঘরের কোণে শ্বেত পাথরের একটি তেপায়া টেবিলের ওপর নীল আলো; বেগম সাহেবা, নবাবের পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। তাঁর পরণে ঢিলে পায়জামা, গায়ে দামী সিল্কের পিরাণ, ফিন্‌ফিনে রঙীন ওড়্‌নায় মাথার আধখানি ঢাকা। সখিনা কিন্তু বাঙ্গালী মেয়েদের মত সাড়ী পরেছে, তবে বড় বড় দুটি চোখে সুরমা টানা। মা, অপরিচিত মেয়ে দুটিকে অভ্যর্থনা করলেন, তারা তাঁরই কাছে নবাবের বিছানার ওপর বসলো। বেগম সাহেবা ভাবলেন, এঁরা বুঝি নার্স, তাই বেশী কৌতূহলী হলেন না। কিন্তু সব চেয়ে বিস্ময় প্রকাশ পেল নবাব সাহেবের; তিনি রক্তহীন ফ্যাকাশে চোখ তুলে তাদের মুখপানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রইলেন।

মেয়েদের অন্যতমা সহাস্যে জিগেস্ করলে, "আমাদের চিনতে পারছেন?"

নবাব সাহেব ঘাড় নেড়ে জানালেন,—না।

"আমরা আপনারই যে অতিথি, সেই ছেলে দুটি আজ মেয়ে হয়েছে। আমাদের এখন যা দেখছেন, সত্যিই কিন্তু আমরা তাই।"

বেগম সাহেবা কিছুই বুঝতে না-পেরে অবাক হয়ে তাদের মুখের দিকে চাইলেন, নবাব সাহেব বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে উত্তর দিলেন, "সে কি? তা কেমন করে—"

তাঁর কথা টেনে নিয়ে, মেয়ে দুটির ভেতর যে বড় সে বললে, "—সম্ভব? না নবাব সাহেব? কিন্তু অসম্ভবও সময়ে সময়ে সম্ভব হয়। আমরা বাঙ্গালী,—হিঁদু। আমার নাম রেণু, আর এর নাম নীলা।"

বৃদ্ধ নবাব যেন আকাশ থেকে পড়লেন; "কিছুই বুঝতে পারছি নে তো!"

রেণু হেসে উত্তর করলে, "ক্রমে পারবেন। আপনি কেমন আছেন আগে তাই বলুন।"

তিনি বুকের ওপর হাত রাখলেন; চোখে মুখে অসহ্য কষ্টের চিহ্ন ফুটে উঠলো।

সখিনা দূরে চেয়ারের ওপর বসেছিল, সে বাবার কাছে এসে দাঁড়াল। চোখদুটি তার ছল ছল।

নীলা সমবেদনার সুরে চুপি চুপি বল্‌লে, "ভয় কি ভাই ? —সেরে উঠবেন।"

সখিনার সেই চোখের জল বড় বড় দুটি ফোঁটা হয়ে ঝরে পড়লো।

রেণু বেগম সাহেবাকে বল্‌লে, "রাত্তির জেগে জেগে আপনার চোখমুখ বসে গিয়েছে, আজ আপনি বিশ্রাম করুন।"

তিনি দুঃখের হাসি হেসে উত্তর দিলেন, "বিশ্রামের দরকার নেই, মা।"

নিজের লোকের ওপর যেমন জোর চলে তেমনি করেই রেণু বল্‌লে, "আপনার কোন কথাই আমরা শুনবো না। ঐখানে বিছানা করে দেব, আপনি ঘুমোবেন, যা কিছু করবার—আমরাই কোরবো।"

"ঘুম কি আর আছে, বাছা ?"

"সেই জন্যেই তো বল্‌ছি অন্ততঃ একটা দিন বিশ্রাম করুন।"

সে রাত্তির মত বেগম সাহেবাকে বাধ্য হয়েই বিশ্রাম নিতে হোল। তিনি বহু বার উঠে এসে খবর নিয়ে যাচ্ছিলেন, আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেয়েদের পরিচর্য্যা দেখছিলেন। এমন কাজ তারা কোথায় শিখেছে ? সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে যে ভাবে তারা সেবা করছিল, নিজে না দেখলে তা বিশ্বাস হয় না। স্নেহে ও কৃতজ্ঞতায় তাঁর নিদ্রাহীন চোখে জল ভরে এল।

উষার আলো

পূর্বদিকের খোলা জানালার সবুজ পর্দায় যখন সূর্য্যের সোনালি আভা এসে পড়েছে তখন সখিনা এসে রেণুদের ডেকে নিয়ে গেল। যেতে যেতে সে জিগেস্ করলে, "বাবা রাত্তিরে কেমন ছিলেন ?"

"খুব ভালো"—নীলা উত্তর দিলে।

"সত্যি ?"

"সত্যি-ই।"

নীলার মুখপানে চেয়ে কাঁদ কাঁদ হয়ে সখিনা জিগেস্ করলে,—"ভাল হবেন ?"

তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে সে বল্লে, "ভাল হবেন বৈকি ; কেঁদ না ভাই, ভয় কি ?"

সমবেদনা পেয়ে সখিনা চোখের জল রোধ করতে পারলে না, নীলার বুকে মাথা লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। তাকে অনেক করে থামিয়ে রেণু বল্লে, "আমরা এখন আমাদের ঘরে চল্লুম, খানিক পরে আবার আসবো।"

সখিনা উত্তর দিলে, "আপনাদের জিনিষ-পত্তর এখানে আনা হয়েছে। আমার ঘরে আপনারা থাকবেন।"

"সে কি ?" রেণুর চোখে মুখে কৌতূহল ফুটে উঠলো।

"সত্যি বলছি। কাল রাত্তিরেই মা সে সব আনিয়ে রেখেছেন।"

"চল তবে।" তারপর তার হাতটি নিজের মুঠোর ভেতর

নিয়ে রেণু বল্‌লে, "তুমি ভাই আমাদের আর 'আপনি' বোলো না। কেমন ?"

সখিনা হাসিমুখে ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

শুধু একদিন নয়, যতদিন না নবাব সাহেব সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন ততদিন রেণু আর নীলা আহার নিদ্রা বিসর্জ্জন দিয়ে তাঁর সেবা করতে লাগলো। তাদের এই অপূর্ব্ব অমানব হৃদয়ের পরিচয়ে নবাব বাড়ীর সকলে মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে; এবার রেণুদের যেতে হবে। কিন্তু যাবার নাম করলেই বেগম সাহেবার মুখ ভার হয়, নবাব সাহেব বলেন, নদীতে এখন বড় তুফান, আর, সখিনার সুরমা-টানা চোখ সজল হয়ে ওঠে। তবুও একদিন তাদের ছেড়ে দিতে হোল। যাবার সময় বেগম সাহেবা রেণুকে এক-গাছি মুক্তোর মালা, আর নীলাকে একটি হীরের আংটি পরিয়ে, চিবুকে হাত দিয়ে চুমো খেলেন। বৃদ্ধ নবাব তাদের মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাদ করলেন। আর সখিনা ?—অতি প্রিয়জনের দীর্ঘ বিরহের পূর্ব্বে বালিকা বধূ যেমন করে কাঁদে, ঠিক তেমনি করেই কাঁদতে লাগলো। রেণুরাও হাসিমুখে বিদায় নিতে পারলে না। চোখ মুছতে মুছতে বোটে গিয়ে উঠলো। রহমত নদীর তীরে বোটের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে খানিক দূর তাদের এগিয়ে দিলেন। নীলা আঁচল দুলিয়ে তাঁকে বিদায় জানালে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

'মানব সমিতি'র দলে এসে রেণু যে কাজে হাত দিয়েছে, তাতেই সফল হয়েছে। তার প্রথম কাজ—মনা দত্তকে সমিতির বন্ধু করা, দ্বিতীয়—জামালপুরের হাঙ্গামায় হিঁদু-মুসলমান সংঘর্ষে তাদের যে স্কুলটি যায় যায় হয়েছিল তাকে বাঁচিয়ে তোলা, শুধু তাই নয়—বাংলার একটি বিশেষ অংশে এই বিরোধের নিবৃত্তি কেবল তারি চেষ্টায় সম্ভব হতে পেরেছিল। যে ভাবে, যে কৌশলে, যেমন বিনা সংঘর্ষে এই দুটি বড় কাজ সে করেছিল সমিতির অন্য কোন সভ্য তা পারতেন কি-না সন্দেহ। শত সহস্র নিয়ম কানুন, বা সামরিক আদেশ, অথবা রক্তপাতেও যে উদ্দেশ্য সফল হয় না, মেয়েদের এক বিন্দু স্নেহে, তাদের সেবা-কুশল হাতের একটি মধুর স্পর্শে তা কেমন সহজে হয়ে ওঠে—রেণুই তার নিদর্শন।

সে নিজের অন্তর মধ্যে যার অস্পষ্ট রূপ দেখেছিল তাকে খুসী করবার জন্যে দুনিয়ায় এমন কোন কঠিন কাজই ছিল না, যা সে করতে পারতো না। তার যা কিছু সাহস, ধৈর্য্য, বল, বুদ্ধি—সবই সে পেত—সেই রূপের যিনি দেবতা তাঁরই কাছ

থেকে। কর্ম্মের একটা নেশা আছে, সেই নেশার মাদকতা কর্ম্মীকে বহু সময় আদর্শ থেকে ভুলিয়ে নে' যায়, রেণুর জীবনে সে ভুল কখনো হয়নি। তার মনের প্রশান্তি—বুদ্ধিকে ঘোলাটে হতে না-দিয়ে পদে পদে তাকে বিপথে যেতে বারণ করেছে। সে বারণ, সেই নিষেধের বাণী এত স্পষ্ট যে, তাকে অবহেলা করবার কোন সাধ্যই তার ছিল না।

রেণুর ধ্যানময় জীবন অন্যান্য মেয়েদের থেকে তাকে স্বতন্ত্র করে রেখেছিল। আসন্ন সন্ধ্যায় নিরালা ছাতের এক ধারে সে যখন চুপটি করে বসে থাকতো, অন্ধকারের মতই তার মনটি যখন পৃথিবীর প্রকাশকে নিজের অন্তর মধ্যে ধীরে ধীরে ঢেকে দিত, তখন কেউ আভাসেও টের পেত না—রেণুর জীবনের আর একটা দিক কত কর্ম্মচঞ্চল, সেখানে তার গতি কী প্রচণ্ড, কী কুটিল, কী আবর্ত্ত-সংকুল!

জীবনে আদর্শ সে খুঁজে পেয়েছিল সুব্রতর কাছে। তাঁর অনাবিল চরিত্র, অফুরন্ত উৎসাহ, অচঞ্চল বুদ্ধি, অপূর্ব্ব মানব-প্রীতি, মনের অবিচ্ছিন্ন ভাগবতমুখী গতি, রেণুর ধ্যানের বস্তু হয়েছিল। মানুষ মানুষকে যতদূর বিশ্বাস করতে পারে, সুব্রতকে সে তার চাইতেও বেশী বিশ্বাস করতো। শুধু সে নয়, সমিতির সব ছেলে-মেয়েই তাদের জীবনের যা কিছু তাঁর উপর ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাক্‌তো।

দাদার এই মহত্ত্ব চিরব্রত কি কিছুই পায় নি?—মৈমনসিং থেকে ফিরে এসে বেণু এ কথা প্রায়ই ভাবতো। যাঁর মনের বল প্রকৃতির কুটিল ভ্রূকুটিকে অবহেলায় উপেক্ষা করে চলে, যে শক্তির কাছে বাধা বলে কোন জিনিষই নেই, যাঁর পথের মাঝখানে অশ্রুর নদী তিনি সাঁতরে পার হয়ে যান, তাঁর ভাই কি-না শোভার ছুফোঁটা চখের জলে গলে গেল? দুর্ব্বল—অতি দুর্ব্বল সে। কিন্তু নির্ম্মম চাবুক তো তাকে ভয় খাওয়াতে পারেনি, কঠোরতর শাস্তি অনিবার্য্য জেনেও সে তো অবিচলিত রয়েছে, তবে তাকে দুর্ব্বলই বা বলি কি করে?

এই সন্দেহ তার মনে প্রথম তুলেছিল দয়া। সে বলেছিল, "দেখ্ রেণু, চিরব্রতকে কিন্তু দুর্ব্বল বলে মনে হয় না—তার সঙ্গে এই কবছর পড়ে তো দেখছি। তবে সে যে কর্ত্তব্যে অবহেলা করেছে, তার অন্য কোন কারণ আছে,—তা হয় তো দুর্ব্বলতা নয়। অমানব মহত্ত্বও সময় সময় দুর্ব্বলতার রূপে প্রকাশ পায়, সাধারণ লোকে সেই বাহ্যিক প্রকাশ দেখে বিচার করে, তার মূল অনুসন্ধান করতে কেউ চায় না, আর পারেও না, আমাদের কিন্তু তাই করলে বড়ই ভুল হবে, ভাই! বিচারের ভার দাদা আমাদের ওপর ফেলে দিয়েছেন, ছেলেরা যাই করুক, আমরা কিন্তু জিনিষটা আগা পাস্তালা বুঝতে চাই। চিরব্রতের দুর্ভাগ্য যে, সে দাদার সহোদর হয়ে জন্মেছে, তা যদি না হোত তবে

তিনি নিজেই তার বিচার করতেন, আর সুবিচারও সে নিশ্চয় পেতো।"

রেণু চট্ করে প্রশ্ন করেছিল, "তবে কি—দাদা তাকে বেত মেরে অবিচার করেছিলেন ?"

দয়া উত্তর দিয়েছিল, "দাদার উপর অশ্রদ্ধা করে আমি কিছুই বল্‌ছিনে। 'নিজের ভাই বলে কিছু করলেন না,'—পাছে কোন সভ্যের মনে মুহূর্ত্তের জন্যও এই অমূলক সন্দেহ উঁকি মারে তাই তিনি চিরব্রতের ওপর এত কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেছিলেন, অথবা তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন, কর্ত্তব্যের পথ কত নির্ম্মম।"

দয়ার এই কথায় রেণুর মনে প্রথম সংশয় জেগেছিল। তাই সভার দিন দলবল নিয়ে, ছেলেদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজে তার বিচারের ভার নিয়েছিল, কিন্তু এখনও সন্দেহ তার একেবারে যায়নি, এখনও মাঝে মাঝে মনে হোত —দুর্ব্বলতা, একমাত্র দুর্ব্বলতাই চিরব্রতের কর্ত্তব্য ত্রুটির প্রধানতম কারণ। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবতো, এই দুর্ব্বলতা যদি সত্য না হয় তবে তো মিথ্যার ওপর দাঁড়িয়েই বেচারীকে শাস্তি দেওয়া হবে। রেণুর যখন এই রকম সংশয়াকুল মনের অবস্থা তখন সে একদিন একা গিয়ে চিরব্রতর সঙ্গে দেখা কর্‌লে।

সে শ্লেষের সুরে বল্‌লে, "তুমি বুঝি আমায় পরীক্ষা করতে এসেছ ?"

রেণু লজ্জিত হয়ে উত্তর দিলে, "ছিঃ ওকি কথা, ভাই। তবে ভাই-বোনের যে স্নেহের দাবী, তারি জোরে আমি শুধু এইটুকু জানতে চাই—অর্দ্ধোদয় যোগের সময় তুমি 'ডিউটি' ছেড়ে তোমার পীড়িত বন্ধুর কাছে গিয়েছিলে কেন ?"

ও-কথার কোন সোজা জবাব না-দিয়ে চিরব্রত বল্‌লে, "তোমাদের 'মিলিটারা ডিসিপ্লিন' আমি সব সময় মেনে চলতে পারি নে।"

"কেন ?"

"অনেক ক্ষেত্রে তা হৃদয়কে দাবিয়ে যন্ত্রের সৃষ্টি করে।"

"কি রকম ?"

"আমার কথাই ধর। যাদের তদ্বিরের ভার আমায় দেওয়া হয়েছিল তারা আমার কে ?—সাধারণ দৃষ্টিতে কেউই নয়। অথচ তাদের দেখবার শোনবার ভার আমার মত আরো অনেকের ওপর ছিল। আমি না থাকলে তাদের কিছু ক্ষতি হোত না, বাস্তবিক হয়ও নি। অথচ যে-বন্ধু আমার হঠাৎ অসুখে পড়েছিল, আমিই তখন তার একমাত্র ভরসা। সময়ে না-গিয়ে পড়লে অসহ্য যন্ত্রণা পেয়ে সে হয় তো মরেই যেত।"

তার মুখের দিকে চেয়ে রেণু বল্‌লে, "কিন্তু—বলে যাওনি কেন ?"

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চিরব্রত উত্তর দিলে, "সময় হয়নি।" তার কথা খুব ঝাঁঝাল।

"আচ্ছা তা নয় হোল, কিন্তু তার পর ? আমাদের সমিতির শত্রু মিঃ দত্তকে সায়েস্তা করবার যখন ভার পড়েছিল, তখন তা অবহেলা করেছিলে কেন ?"

চিরব্রত খানিক চুপ করে রইলো ; তারপর ঈষৎ হেসে বল্‌লে, "এর উত্তর আমি একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে দেব, কিন্তু লক্ষ্মীটি, রাগ করতে পাবে না। তোমার যখন বে' হবে, তখন সেই ভদ্রলোককে আমি কখনো কোন কারণেই লাঞ্ছিত করতে পারবো না, বুঝলে ? এতে আমায় দুর্ব্বল, কাপুরুষ, যা খুসী তাই বলতে পার।"

রেণু এতই লজ্জিত হয়ে পড়লো যে, কোন প্রশ্ন বা উত্তর কিছুই তার মুখে এল না ; কিন্তু এই সামান্য আলোচনাতেই তার মন থেকে সংশয়ের কালো আবরণখানি সরে গিয়ে তাকে চকিতে দেখিয়ে দিলে, দাদার মত না হলেও চিরব্রত তাঁর চাইতে ছোট নয়। তাঁদের পার্থক্য এইটুকু যে, সকলের ওপর দাদার সমান ভালবাসা ; আলোর মত, বাতাসের মত সকলেরই তাঁর ওপর সমান অধিকার, তবে, অনেকের মুখ চেয়ে তিনি নিজেকে

অথবা যে-কোন-ভালবাসার বস্তুকে অম্লানবদনে বিসর্জ্জন দিতে পারেন, তাতে তাঁর এতটুকুও বাধে না। আর চিরব্রত? —তার ভালবাসা একনিষ্ঠ, যাকে সে ভালবাসে তার স্রোতে সে নিজেকে ও সকলকে তৃণের মতই ভাসিয়ে দিতে চায়। একই মৃণালে এই দুটি কমল ফুটেছে, দুটিরই অপার্থিব সৌন্দর্য্য রেণুকে আজ মুগ্ধ করেছে।

চিরব্রত সামনে বসে। তার মৌন মুখপানে চেয়ে রেণু আপন মনেই বল্‌ছে, তুমি এখানে কেন ভাই, এ তো তোমার স্থান নয়। এই সংঘর্ষের আগুনে তোমার নবনীত কোমল মনটুকু যে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, এর উত্তাপ তুমি তো সহ্য করতে পারবে না। এ আগুনের খেলায় তুমি মেতেছ কেন? ফিরে যাও—ভাই, ঘরে ফিরে যাও। যে কুমারী তোমার হাত ধরে সংসার-আঙ্গিনায় গিয়ে দাঁড়াবে—কে সে ভাগ্যবতী জানি না—পরশমণি ছুঁয়ে সে সোণা হয়ে যাবে। এ কী অদ্ভুত ছেলে! শৈশব সখীর স্বামী যাতে অমর্য্যাদায় না পড়েন, তার জন্যে নিজেকে সে কী সঙ্কটেই না ফেলেছে! সে আজ কর্ত্তব্যচ্যুত, সমিতির ছেলেদের কাছে অপমানিত, অনেকের কাছে বিশ্বাসঘাতক বলেও পরিচিত; একবার এই মহান্ হৃদয়ের জন্যেই দাদার হাতে বেতের আঘাতে জর্জ্জরিত হয়েছে, এবার আরো কি গুরুতর শাস্তি তার কপালে আছে—কে জানে? দাদা কি

জানেন না—কত বড় স্বার্থত্যাগী বীর সে? পরক্ষণেই দয়ার কথা রেণুর মনে হোল—তিনি সবই জানেন, এ কেবল দেখাবার জন্যে।—কর্ত্তব্যের পথে সমিতির ছেলে-মেয়েরা আরো কঠোর, আরো শক্ত হবে বলে।

দাদা তাকে শাস্তি দিতে চান,—সে ভার আমি নিয়েছি। যদি কিছুই না করি, তিনি রাগ করবেন, হয় তো আমার ওপর তাঁর বিশ্বাসও নষ্ট হয়ে যাবে, শুধু তাই নয়, তিনি নিজে তার শাস্তির ভার নেবেন, তখন যা পুরস্কার সে পাবে।—রেণুর চোখ জলে ভরে এল। কি করে তার সম্মান রক্ষা করা যায়, শাস্তির আবরণে কি করে তার হৃদয়ের যথার্থ পুরস্কার তাকে দেওয়া যায়, অথচ সমিতির কঠিন নিয়ম কানুন থেকে রেহাই দিয়ে, কি করে তার জীবনকে স্বতন্ত্ররূপে—আপনার মহিমায় ফুটিয়ে তোলা যায়?—রেণুর মন যখন এইরূপ চিন্তাকুল, মেঘের পর মেঘ জমে তার বুদ্ধিকে যখন আচ্ছন্ন করেছে ঠিক সেই সময় তড়িতের মত একটি আলোক-রেখা সেই মেঘকে দুফাঁক করে চলে গেল,—তারি ক্ষণিক আভায় সে পথ খুঁজে পেলে।

চিরব্রতের আরো কাছে সরে গিয়ে রেণু বসলো।

"তোমার মতলবখানা কি?" চিরব্রত পরিহাস করে জিগেস্ করলে।

তার মুখের দিকে চেয়ে, কিন্তু—কিন্তু করে রেণু বলে ফেল্‌লে, "তুমি কি দয়াকে ভালবাস ?"

লজ্জায় চিরব্রতের মুখ লাল হয়ে উঠলো ; মুহূর্ত্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে রূঢ়স্বরে সে জিগেস্ করলে, "এর মানে ?"

রেণু কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে, তেমনি হাল্কা হাসিমুখেই উত্তর দিলে, "মানে অতি সোজা। তুমি কি আমার প্রিয় বন্ধু, তোমার সতীর্থ, মায়ার দিদি দয়াকে ভালবাস ?"

"অতি আপত্তিকর ও অবান্তর এই প্রশ্ন"—বলে চিরব্রত উঠে পড়লো।

বাঁ হাতে রুমালে মুখ ঢেকে, ডান হাতে চিরব্রতের জামার কোণ ধরে টেনে তাকে বসিয়ে দিয়ে রেণু বল্‌লে, "রাগ কোরো না, ভাই ! তবে, বৃথাই তুমি গোপন করছো।"

চিরব্রত আগুন হয়ে জিগেস্ করলে, "কে তোমায় এ সব কথা বলেছে ?"

"কে আবার বল্‌বে ?—আমি নিজেই জানি।"

"কি করে জানলে ?" সঙ্কুচিত হয়ে চিরব্রত প্রশ্ন করলে।

রেণু একমুখ হেসে বল্‌লে, "পথে এসো ভাই। এবার কথার ফাঁকে ধরা পড়েছ। তোমাদের চোখের ভাষা, মনের সব কথা আমাদের বলে দেয় ;—বুঝলে ?"

চিরব্রত আর কোন উত্তর না দিয়ে মাথা নীচু করে বসে রইলো।

রেণুর চুলগুলি কবরীমুক্ত হয়ে পিঠময় ছড়িয়ে পড়েছিল; কতকগুলি কোলের ওপর এসে হাওয়ার সঙ্গে খেলছিল। মাথার ওপর তাদের জড়িয়ে, গ্রীবা বেঁকিয়ে, বড় বড় চোখ দুটি বিস্ফারিত করে সে বল্‌লে, "চিরব্রত, আমার বিচার আমি এখনই করতে চাই।—তুমি প্রস্তুত?"

"হ্যাঁ"—নিতান্ত হতাশ ভাবে চিরব্রত উত্তর দিলে।

"তবে শোন", যথাসম্ভব গম্ভীর হয়ে রেণু বল্‌লে, "মানব-সমিতিতে তোমার আর স্থান নেই, তবে একেবারে তোমায় নিরাশ্রয় করবো না, দয়ার কাছে তোমার ঠাঁই করে দেব।"

"আর আমায় জ্বালাতন কোরো না, রেণু, তোমার পায়ে পড়ি"—অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে চিরব্রত উত্তর করলে।

রেণু দাঁড়িয়ে উঠে তার দুটি হাত ধরে বল্‌লে, "রাগ করলে, ভাই? ছিঃ! বোনের কথায় এত রাগ?"

"তুমি আমায় অপমানিত করলে কেন?"

রেণু তার হাত ছেড়ে দিয়ে বল্‌লে, "হ্যাঁ, তা করেছি। কিন্তু ওটা লোকদেখান। আসল কথা কি জান? সমিতির বন্ধন থেকে তোমায় আমি মুক্ত করে দিতে চাই। এর ভেতর থাকলে তোমায় আমরা হারিয়ে ফেলবো। তোমার ভেতর যিনি

নিশি দিন জেগে রয়েছেন,—সেই নির্ম্মল, উদার, স্নেহময় পুরুষকে শাসনের বেত্রাঘাতে আমি আর কিছুতেই জর্জ্জরিত হতে দেব না। তিনি স্বচ্ছন্দে বিহার করুন, দয়াকে নিয়ে তিনি আনন্দে থাকুন।"

"আবার!"—এবার চিরব্রত হেসে ফেল্‌লে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

"দয়া ?"

"কি ভাই !"

"আমার একটা কথা রাখবি ?"

"কি—?"

"তোকে বে' করতে হবে।"

"আপত্তি নেই। তোকে পেলে বে' করা কেন, যমের মুখে যেতেও রাজি আছি।" রেণুকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে, তার মুখের অতি নিকটে মুখখানি রেখে দয়া এই কথা বল্‌লে।

"তামাসা নয়, সত্যি বলছি ; চিরব্রতকে আমি এই মাত্র কথা দিয়ে এলুম।"

দয়া ভেবেছিল রেণু তামাসা করছে। এখন বুঝতে পেরে সে বল্‌লে, "এ কি ছেলেমান্‌ষী আরম্ভ করেছিস্, ভাই ?"

"ছেলেমান্‌ষী কি রকম ?"

"তা নয় তো কি ? কোথায়ও কিছু নেই, বে'।"

"কোথায়ও কিছু নেই—? মিথ্যে কথা বলিস্‌নি, দয়া।"

দয়া হেসে বল্‌লে, "কেবল ভাঁওতা ; এ আর কেউ নয় যে ধাপ্পা মেরে—"

অনুযোগের সুরে রেণু উত্তর করলে, "ও—বুঝেছি, তুই আমার কাছে অনেক কিছুই গোপন করিস্।"

তার চিবুক ধরে সস্নেহে দয়া বল্লে, "তুই ভাই বড় অভিমানী। কি হয়েছে—বল্ না?"

রেণু হেসে ফেল্লে, "আমি বোল্ছি চিরব্রতকে তোমায় বে' করতে হবে।"

"কিন্তু—কেন, কি বৃত্তান্ত কিছুই তো বল্লিনে।"

"এর উত্তর এই যে, সে তোকে ভালবাসে। আর এক কথা—নিয়ম-শৃঙ্খল-ভারে সে পঙ্গু হয়ে পড়েছে; তার মানবতা—স্নেহ, ভালবাসা ও মমতা—প্রকাশের জন্যে উন্মুখ হয়ে রয়েছে; কেবল একটা আধার—সামান্য একটা উপলক্ষ্য চায়।"

দয়া জিগেস্ করলে, "তবে কি আমাদের সমিতি মানবতার বিরুদ্ধে? এর ভেতর থাকলে কি মানুষের মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়ে যায়?"

রেণু বল্লে, "সকলের পক্ষে নয়, তবে চিরব্রতের মত যাদের মন তাদের পক্ষে তাই। সমিতি বা দল খুব বড় জিনিষ নয়, দয়া, শুধু একত্রে কাজ করবার জন্যে ওর প্রয়োজন। ওটা চেতন বস্তু নয়—প্রাণহীন জড়। চেতন মানুষ তার চাইতে ঢের বড়, তার ঢের ওপরে। মানুষের মনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা, আর সমষ্টি-শক্তিতে কাজকে এগিয়ে দেওয়া—সমিতির উদ্দেশ্য। কিন্তু তার নিয়ম-শৃঙ্খলে মানুষের মন যখন অসহায়রূপে বাঁধা

পড়ে, গুটিপোকার মত মানুষ যখন আপনার রচিত আবেষ্টনে আপনি বদ্ধ হয়, হৃদয়ের ধর্ম্মকে, বিচার-বুদ্ধিকে সমিতির নিয়ম যখন সঙ্কুচিত করে, তখন সভ্যের পক্ষে তা মৃত্যুতুল্য। চিরব্রতের যে রকম মানসিক গঠন, ও যদি আর কিছুদিন 'মানব-সমিতি'র সভ্য থাকে, তবে সমিতির মতই বেচারী, হৃদয়হীন জড় পদার্থে পরিণত হবে। তাই বলি—ওতে ওর আর কাজ নেই, তোর হাত ধরে বরং গৃহ-আঙ্গিনায় গিয়ে ও দাঁড়াক, তা হলে ফুল ফুটবে সেখানে, ফল ফলবে।"

"কিন্তু ভাই, বে' করা যে বড় কঠিন—" দয়া উত্তর দিলে।

রেণু হেসে বল্‌লে, "কেন?"

"মনে নেই তোর—দাদার সঙ্গে প্রথম যেদিন দেখা, তিনি কি বলেছিলেন?—'জায়ার কর্ত্তব্য বড় কঠিন। তার একমাত্র কর্ত্তব্য—স্বামীকে মানুষ করা, যাতে সে নিঃস্বার্থ হতে পারে, যাতে তার মন তুচ্ছ ভোগায়তন থেকে উঠে গিয়ে দেশের কল্যাণের জন্যে সমস্ত দুঃখ বরণ করতে পারে; স্ত্রীর যা অক্ষুণ্ণ দাবী তা ভুলে গিয়ে, যাতে স্বামীর অন্তঃকরণ বজ্রের মত কঠোর হয়, নিজের কর্ম্মে ও আচরণে তার সেই বীরত্বকে জাগিয়ে তোলাই জায়ার একমাত্র সাধনা।'—এর প্রত্যেক কথাটি আমার মনে আছে। দিনের মাথায় পাঁচশো বার ভাবি কি-না, তাই মুখস্ত হয়ে গেছে।"

রেণু বল্‌লে, "এ আর এমন কঠিন কি ?"

"রাণী"—দয়া আদর করে রেণুকে মাঝে মাঝে 'রাণী' বলে ডাকতো, "তুই এর কি বুঝবি ? ভগবান নিরালায় বসে তোকে আলাদা মাটি দিয়ে গড়েছেন, তুই এই পৃথিবীর মেয়ে হয়েও এখানকার কেউ নয়, তোর মন আলাদা, হৃদয় আলাদা, তোর সবই আলাদা, আমাদের মনের ভেতর কি আছে তুই কি করে জানবি ? কামনা এখানে উদ্যত ফনা ধরে দিবানিশি গর্জ্জাচ্ছে—ভয়ে যে বুক কেঁপে ওঠে, ভাই ! চিরব্রত আমায় বহুদিন থেকে ভালবাসে, আমিও তাকে ভালবেসেছি—দেহ আর মন প্রতিমুহূর্ত্তে পরস্পরকে আকর্ষণ করছে, কত কষ্টেই না তাদের রোধ করে রেখেছি—কিন্তু, বিয়ের পর কি করে আর তাদের বারণ করবো, তারা আমার নিষেধ শুনবে কেন ?"

রেণু মৌন হয়ে রইলো।

দয়া জিগেস্ করলে, "তুই কি আমার ওপর রাগ করলি ?"

তার মুখের দিকে তাকিয়ে রেণু উত্তর দিলে, "রাগ করবো কেন ? তবে একটা কথা—তুই কি বে' কর্‌বি নে ?"

"কর্‌বো তুই যখন বলছিস্ ;" ম্লান হাসি হেসে দয়া বল্‌লে, "কিন্তু ভাই, যার ভার আমার ওপর দিচ্ছ তাকে যদি কখনো নামিয়ে ফেলি, আমায় ক্ষমা করিস্।"

তাকে কোলের ভেতর টেনে নিয়ে, রেণু বল্‌লে, "ক্ষমা

করবো—আমি? দয়া, তুই কি পাগল হলি? আর, এতে ক্ষমা করবারই বা কি আছে? আমার মনে হয়, দাদার কথা তুই ঠিক বুঝতে পারিস্‌নি।"

যেন অকূলে কূল পেয়ে দয়া জিগেস্ করলে, "কি রকম?"

রেণু বল্‌লে, "জায়ার দৃষ্টি স্বামীর স্থূলাবরণ ভেদ করে তার অন্তরতম পুরুষকে যদি দেখে, তাকে যদি সে ভালবাসে, তবে আর ভোগায়তনের প্রতি তার আকর্ষণ থাকে কেমন করে? যা থাকে তা আকর্ষণ নয়,—আনন্দ।"

দয়া অবাক হয়ে বল্‌লে, "তুই এ সব কি করে জান্‌লি? কার পাঠশালায় এর পাঠ নিয়েছিস, ভাই!"

রেণু হেসে ফেল্‌লে, তার পর নিজের বুকের ওপর হাত রেখে বল্‌লে, "এর ভেতর যিনি রয়েছেন, যিনি স্নেহময়—করুণাময়, যিনি আমার হৃদয়-দেবতা, স্বামী—প্রিয়তম, নিশিদিন যাঁকে চোখে চোখে দেখি, পিছু পিছু যাঁর পদধ্বনী শুনি, তিনিই আমায় সকল কথা জানিয়ে দেন, বোন্।"—তার দুটি চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে এল।

"তুই দেখিস্ তাঁকে?"

"হ্যাঁ দেখি, ধরার ধূলিতে ধূলিতে দেখি। এই যে তোর ভেতর তাঁকেই দেখছি।"—এই বলে দয়াকে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে, রেণু তার চুমো খেলে।

তার চোখের জলে দয়ার বুক ভেসে গেল।

তাকে জড়িয়ে ধরে রেণু অনেকক্ষণ বসে রইলো। বিস্ময়ে—পুলকে দয়ার মুখে কথা নেই। এ কি অদ্ভুত মেয়ে! আধফোটা কমলিনীর মত যে সুন্দর, প্রভাত শেফালীর মত যার সৌরভ, তারুণ্য যাকে সর্ব্ব রূপে সর্ব্ব শোভায় সাজিয়েছে—বিজয়িনীর মত সে তাকে পায়ে পায়ে দলিত করে চলেছে—!

*   *

এর ভেতর দুমাস কেটে গিয়েছে; আজ দয়ার বে'। সমিতির ছেলে-মেয়েরা এসেছে, বর-বধূর সহপাঠীরাও নিমন্ত্রিত হয়েছে। দিল্লীর মুকটরাম, লাহোরের মধুসিং, বম্বের সোহনলাল, মাদ্রাজের রামস্বামী, সিঙ্গাপুরের ল্যাং চাং—আরো অনেক শাখাকেন্দ্রের প্রতিনিধিরা বিবাহ-বাসরে এসেছেন। দয়ার বাবা মিঃ দত্তকে ছেলেদের, আর শোভাকে মেয়েদের দেখবার ভার দিয়েছেন। মায়া, গুলুদি, নীলা সারাদিন আনন্দে নেচে বেড়াচ্ছে। রেণু সব সময় দয়ার কাছে কাছে ফিরছে।

সন্ধ্যার পর বন্ধুরা তাকে সাজাতে বসলো; দস্যি দয়া যেন আজ সন্ধ্যামণির মতই স্নিগ্ধ হয়েছে। তার আঁখিপল্লব আনত, মুখে সলজ্জ মৃদু হাসি, সখীদের কৌতুক-পরিহাসে কর্ণমূল পর্য্যন্ত ক্ষণে ক্ষণে লাল হয়ে উঠছে।

শোভা বল্লে, "ভাগ্যিস্ তো আমার সঙ্গে চিরব্রতের বে' হয়ে যায়নি!"

রেণু পরিহাস করে উত্তর দিলে, "তা হলে কিন্তু বেশ মানাতো, শোভাদি।"

মায়া বল্লে, "হলেই হোল অমনি, দিদি যে রোজ কালী-ঘাটে মানসিক করতো।"

"চুপ কর্ বলছি, তুই ভারি ফাজিল্ হয়েছিস্,"—দয়া যেন চটে গিয়েছে, কিন্তু চোখে মুখে প্রচ্ছন্ন হাসি।

* *

বিবাহ-সভার এক পাশে সুব্রত বসে আছেন। মাঝখানে চিরব্রত। দাদা প্রশান্ত নয়নে মাঝে মাঝে তাকে দেখ্ছেন। চোখের দৃষ্টি অন্তরের শুভেচ্ছা বহন কোরে ভাইকে যেন অভিষেক করছে।

* *

বে'র আসনে গিয়ে বসবার আগে দয়া সুব্রতকে একবার দেখতে চাইলে। সে তাঁকে আজ একান্তে পেতে চায়। একেবারে একেলা, রেণুও কাছে থাকবে না। নীলা, দাদাকে দয়ার পড়বার ঘরে ডেকে নিয়ে এল।

অতি ধীরে ধীরে, সরম জড়িত পদে সে এসে সুব্রতর কাছে দাঁড়ালো; মরি, মরি, কি সুন্দর মানিয়েছে! সর্ব্বাভরণ ভূষিত

অঙ্গ, পরণে লোহিত অম্বর, গলায় মুক্তার হার, হাতে প্রস্ফুটিত কমলদল, খোঁপায় বকুল-মালা,—এই নববধূ বেশে, দাদার হাতে ফুলগুলি দিয়ে, দয়া তাঁকে প্রণাম করলে।

পদ্মের আঘ্রাণ নিয়ে, হাসিমুখে সুব্রত বসলেন।

তাঁর কোলে মুখ লুকিয়ে দয়া কাঁদতে লাগলো।

"কাঁদছো কেন, দয়া?" অতি সস্নেহে তার মাথায় হাত রেখে সুব্রত জিগেস্ করলেন।

দয়া কোন উত্তর দিল না। নিতান্ত বালিকার মতই ডুক্‌রে ডুক্‌রে কেঁদে অনেকক্ষণ পরে যেন শান্ত হোল। তার পর, সুব্রতর মুখপানে আঁখি তুলে বল্‌লে, "দাদা, আপনার ভাই যেন আমায় পেয়ে আমার দেশকে ভুলে না যায়, শুধু এই আশীর্ব্বাদ—।"

কথা শুনে সুব্রত চমকে উঠলেন। এ কি সত্য? সত্যই কি দয়া এই ভিক্ষা চাইছে? এও কি সম্ভব? পুষ্পিত যৌবনা কুমারী, সুশিক্ষিতা, সুমার্জ্জিতা, আভিজাত্য ঘরের দুহিতা, বিবাহ-বাসরে চোখের জলে ভেসে প্রার্থনা করছে,—তার জীবনের আনন্দ, নয়নের মণি, তাকে পেয়ে যেন দেশকে ভুলে না যায়! মা, তুমি এ কী শোনালে? কেন শোনালে? কেন তুমি এত আশা দিলে—?

* *

বে'র পরের দিন 'মানব-সমিতি'র সভা বসলো। এ সভার সভানেত্রী দয়া। সমিতির সকল কর্ম্মী—বিভিন্ন প্রদেশের সকল প্রতিনিধি তার নির্দ্দেশ আজ মাথা পেতে নেবেন, দয়ার বে'তে এই তাঁদের শ্রেষ্ঠ উপহার—স্নেহের শ্রেষ্ঠ অবদান!

গত বছরে সমিতির যা যা কাজ হয়েছে, প্রথমে তার আলোচনা হোল। দেখা গেল, ভারতের সমস্ত প্রদেশে—সিঙ্গাপুর প্রভৃতি নিয়ে বালক-বালিকা ও শ্রমজীবীদের জন্যে মোট সাতশ-আটান্নটি নতুন স্কুল খোলা হয়েছে, কৃষকদের পাঁচ হাজার বিঘে গোচারণ-ভূমী দেওয়া হয়েছে, তা ছাড়া জনসাধারণকে তাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়ে দেবার জন্যে পঞ্চাশ জন কর্ম্মী পরিব্রাজক বেশে ভারতের সর্ব্বত্র পর্য্যটন করছেন; তাঁরা এখনও ফেরেননি।

সুব্রতর কার্য্য-বিবরণী পাঠ শেষ হলে, সভানেত্রীর আসন থেকে দয়া বল্‌লে, "সর্ব্বসাধারণে শিক্ষার বিস্তারই যখন জাতিকে বাঁচাবার মহৌষধ তখন এই কাজই আমাদের জীবনের প্রধান সাধনা। আমার মনে হয়, শিক্ষাকে সুগম করবার একটি সহজ উপায়—প্রতি বছর মাত্র পাঁচজনকে সামান্য বাংলা-ইংরেজী শেখাবেন, সমিতির প্রত্যেক সভ্য যদি এরূপ প্রতিজ্ঞা করেন, যারা তাঁদের কাছে শিক্ষা পাবে তারাও যদি আবার ঐরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়, তা হলে কয়েক বছরের মধ্যেই

দেশের সর্ব্বত্র শিক্ষার সুবিস্তার হবে। আর এ কাজ এত সহজ ও স্বাভাবিক যে, এতে কেউ অসুবিধে বোধও করবেন না। আমি জানি, সমিতির কোন সভ্যই সুবিধে-অসুবিধে কখনো গ্রাহ্য করেন না ; তাই 'অসুবিধে' কথাটা এখানে আমি এই অর্থে ব্যবহার করেছি যে, এ কাজ করেও সমিতির অন্য কাজ করবার তাঁরা যথেষ্ঠ সময় পাবেন—সময়ের অভাব তাঁদের হবে না।

"আর একটি কথা আমি সবিনয়ে নিবেদন করছি, আমার ভাই-বোনেরা যেন কখনো মনে না করেন,—এই সমিতিই তাঁদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। আমাদের উদ্দেশ্য—মনুষ্যত্ব লাভ, সেই জন্যেই এই সমিতির নাম 'মানব-সমিতি।' মানবতার বিকাশ, জ্ঞানের বিস্তার, তার সঙ্গে মনেরও সংযম যদি না হয় তবে 'মানব-সমিতি'র নাম নিরর্থক হয়ে যাবে, শুধু তাই নয়—এ আমাদের নিজেদের ও সমাজের খুবই ক্ষতি করবে। এই যে আমরা এতগুলি ছেলে-মেয়ে দেশের কাজ করবার জন্যে হাতে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছি, যদি আত্মার উন্নতি না হয় তবে পরস্পারের অশুদ্ধ আকর্ষণ থেকে কে আমাদের বাঁচিয়ে রাখবে?" শেষের দিকে দয়ার কথাগুলি অস্পষ্ট হয়ে এল, মুখ ক্ষণে ক্ষণে লাল হয়ে উঠলো, লজ্জায় সে যেন মরে গেল, তবুও কোনরূপে মনের ভাব প্রকাশ করে ফেল্‌লে, তার পর সামলে নিয়ে বল্‌লে—

"এখানে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা সকলেই আমার পূজনীয়। কেউ কেউ আমার সমবয়স্ক ও কনিষ্ঠ হলেও সর্ব্ব বিষয়ে তাঁরা আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাই, আপনাদের সকলের কাছে আমার প্রার্থনা—যাকে পাবার জন্যে মানুষ উন্মুখ হয়ে থাকে তার জন্যে আমি যেন কখনো ব্যাকুল না হই, যাকে লাভ করে নর-নারী অন্য সব ভুলে যায়—সে যেন আমাদের দুজনকে কোনদিন না ভোলায়, যে আগুনে দুর্ব্বল পুড়ে মরে—তার আলোক যেন আমায় পথ দেখায়, সকলকে যে ক্রীতদাস করে—সে যেন আমার পায়ে পায়ে ফেরে, দুঃখের মুকুট পরে সমাজের কাজে—দেশের সেবায় যেন আমার জীবন যায়।"

সভার পর দয়া সকলকে নিজের হাতে খাওয়ালে। আজ সকলেই আছেন—কেবল চিরব্রত নেই। রেণুর আদেশ সে অমান্য করেনি।

* *

রাত্তিরে ফুলশয্যা। দয়ার সব সখীরা এসেছে। নানা রংয়ের কাপড় পরে, নানা ছাঁদে কবরী বেঁধে, নানা সৌগন্ধে সুরভিত হয়ে তারা আজ দেখা দিয়েছে। শোভা ছাড়া তাদের ভেতর পরিণীতা কেউ নেই। কুমারীদের আনন্দে ও কলহাসে সমস্ত বাড়ীখানি যেন সজীব হয়ে উঠেছে!

অনেক রাত্তিরে তারা বিদায় নিয়ে চলে গেল। কেউ

দয়াকে বুকের ভেতর টেনে নিলে, কেউ চিম্‌টি কাট্‌লে, কেউ চুমো খেলে। সব শেষ গেল শোভা। যাবার আগে দয়াকে সে চিরব্রতের কাছে রেখে গেল।

ঘরখানি ফুলে ভরে আছে। সমস্ত বিকেল ধরে রেণু কত যত্ন করে সাজিয়েছে ; তাদের শয্যাতেও ফুল ছড়িয়ে রেখেছে। একপাশের ফুল সরিয়ে চিরব্রত শুয়ে আছে। দয়া তার পাশে গিয়ে বসলো।

"এখনও ঘুমোওনি ?" সে জিগেস্‌ করলে।

চিরব্রত হেসে বল্‌লে, "ঘুম পালিয়েছে।"

আদর করে—তার চুলগুলি নিয়ে খেল্‌তে খেল্‌তে দয়া বল্‌লে, "তুমি ভেবেছিলে আমায় ফাঁকি দেবে, কিন্তু সেই আমার কাছেই তো ভাই, শেষে ধরা দিতে হোল।"

"এখনও—'ভাই' ?"—চিরব্রত হেসে ফেল্‌লে।

খুবই লজ্জিত হয়ে দয়া জিব কাট্‌লে ; তার মুখে আর কথা ফুটলো না।

তার পর চিরব্রতের মাথাটি কোলের ওপর তুলে নিয়ে, জুঁই-বেল-বকুল ফুলের মালা জড়ানো পাখা দিয়ে ধীরে ধীরে তাকে বাতাস করতে লাগলো।

সুরভিত মৃদু বাতাসে চিরব্রতের দুটি চোখ মুদিত হয়ে এল, খানিক পরেই সে ঘুমিয়ে পড়লো।

উষার আলো

শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ তখন আকাশে, তারি এক ঝলক হাসি খোলা জানালা দিয়ে এসে ঘরের ভেতর আলো করেছে। সেই আলোর ঈষৎ আভায় চিরব্রতের মুখপানে চেয়ে সহসা দয়ার মনে হোল,—কে ইনি? স্বামী হয়ে যিনি তাকে আনন্দ দিতে এসেছেন—তাঁর নাম কি?—দেশ কোথায়? রেণু চোখে চোখে যাঁকে দেখে, পিছু পিছু যাঁর পদধ্বনি শোনে,—ইনি বোধ হয়—সেইজন্য। এ তাঁরি মুখ, তাঁরি বুক, তাঁরি মুদিত আঁখি, তাঁরি ঘুমন্ত হাসি। যাঁর বিরাট ছায়া এই আকাশ, যাঁর উত্তরীয় এই বাতাস, যাঁর হাসি এই চন্দ্রকিরণ—তিনিই আমার কোলে এই যে ঘুমিয়ে আছেন!

ঘুমোও—ঘুমোও প্রিয়তম—ঘুমোও——

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

চিরব্রত আর দয়া দুজনে মুখোমুখী হয়ে বসে। বর নববধূকে রবি ঠাকুরের কবিতা শোনাচ্ছে,—

দুয়ার-বাহিরে যেমনি চাহিরে
মনে হল যেন চিনি,—
কবে নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা,
ছিলে লীলা-সঙ্গিনী?
কাজে ফেলে মোরে চলে গেলে কোন্ দূরে!
মনে পড়ে গেল আজি বুঝি বন্ধুরে?
ডাকিলে আবার কবেকার চেনা সুরে—
বাজাইলে কিঙ্কিণী!
বিস্মরণের গোধূলি-ক্ষণের
আলোতে তোমারে চিনি!

* *

মনে আছে সে কি সব কাজ, সখি,
ভুলায়েছ বারে বারে।
বন্ধ দুয়ার খুলেছ আমার
কঙ্কণ-ঝঙ্কারে।

উষার আলো

ইসারা তোমার বাতাসে বাতাসে ভেসে
ঘুরে ঘুরে যেত মোর বাতায়নে এসে,
কখনো আমের নব মুকুলের বেশে,—
কভু নব মেঘ-ভারে।
চকিতে চকিতে চল-চাহনিতে
ভুলায়েছ বারে বারে।

দয়া মুখ টিপে টিপে হাসছে। কবিতার বইখানি সে কেড়ে নেবার চেষ্টা করলে। চিরব্রত দুজনের মাঝখানে হাতের আড়াল দিয়ে পড়তে লাগলো,—

নদী-কূলে কূলে কল্লোল তুলে
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে।
বনপথে আসি করিতে উদাসী
কেতকীর রেণু মেখে।
বর্ষা শেষের গগন-কোণায় কোণায়,
সন্ধ্যা-মেঘের পুঞ্জ সোনায় সোনায়
নির্জ্জন ক্ষণে কখন্ অন্য-মনায়
ছুঁয়ে গেছ থেকে থেকে।
কখনো হাসিতে কখনো বাঁশীতে
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে।

উষার আলো

কি লক্ষ্য নিয়ে এসেছ এ বেলা
কাজের কক্ষ-কোণে ?
সাথী-খুঁজিতে কি ফিরিছ একেলা
তব খেলা-প্রাঙ্গণে ?
নিয়ে যাবে মোরে নীলাম্বরের তলে
ঘর-ছাড়া যত দিশা-হারাদের দলে,
অযাত্রা পথে যাত্রী যাহারা চলে
নিষ্ফল আয়োজনে ?
কাজ ভোলাবারে ফেরো বারে বারে
কাজের কক্ষ-কোণে !

চিরব্রতের মুখে বেদনা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। ঝাপ্‌সা আঁখি তুলে সে একবার দয়ার মুখপানে চেয়ে নিলে,—

দেখ নাকি, হায়, বেলা চলে যায়—
সারা হয়ে এল দিন।
বাজে পূরবীর ছন্দে রবির
শেষ রাগিণীর বীণ।
এতদিন হেথা ছিনু আমি পরবাসী,
হারিয়ে ফেলেছি সেদিনের সেই বাঁশি,
আজ সন্ধ্যায় প্রাণ ওঠে নিঃশ্বাসি
গানহারা উদাসীন।

উষার আলো

কেন অবেলায় ডেকেছ খেলায়,
সারা হয়ে এল দিন।

*　　　*

যদি রাত হয়—না করিব ভয়,—
চিনি যে তোমারে চিনি।

দয়াকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে চিরব্রত আবার পড়লে,—

যদি রাত হয়—না করিব ভয়,—
চিনি যে তোমারে চিনি।
চোখে নাই দেখি, তবু ছলিবে কি,
হে গোপন-রঙ্গিনী ?
নিমেষে আঁচল ছুঁয়ে যায় যদি চলে,
তবু সব কথা যাবে সে আমায় বলে,
তিমিরে তোমার পরশ-লহরী দোলে
হে রস-তরঙ্গিণী !
হে আমার প্রিয়, আবার ভুলিয়ো,
চিনি যে তোমারে চিনি।

কবিতার শেষ চরণ তখনও ঘরের ভেতর গুঞ্জরিত হচ্ছে—শোভা হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লো; পিছুনে রেণু। তারা এতক্ষণ দোরের আড়ালে আড়ি পেতেছিল।

চোখের নিমেষে দয়া চিরব্রতের কোল থেকে ছায়ার মত সরে গেল।

তাকে বুকের ভেতর চেপে ধরে শোভা বল্লে, "চোর—, তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে আদর খাও!"

তার দেহ-লতা শোভার গায়ে এলিয়ে দিয়ে দয়া উত্তর করলে, "তোমার বাসি হয়ে গেছে, ভাই, এবার পালা আমার।"

চিরব্রত আস্তে আস্তে সরে পড়ছিল। দয়াকে ছেড়ে দিয়ে শোভা খপ্ করে তার হাতখানা ধরে ফেল্লে, "এই আর এক চোর পালাচ্ছে।"

ঘরের ভেতর হাসির ফোয়ারা ছুটলো।

রেণু এতক্ষণ কোন কথাই বলেনি। তাকে দেখিয়ে দয়া জিগেস্ করলে, "ও কেন চুপ করে আছে, শোভাদি?"

"কি জানি ভাই?" তার পর রেণুর দিকে চেয়ে শোভা হেসে ফেল্লে। "ভালবাসায় কখনো ত পড়েনি—এ সব কি করে জান্‌বে বল? তাই এখানে এসে ও বড় ফ্যাসাদে পড়ে গিয়েছে। জানালার ফাঁক দিয়ে তোমাদের দেখে, বেচারী পালিয়ে যাচ্ছিল; আমি না থাকলে ওর নেমন্তন্ন করাই হোত না।"

চিরব্রত উৎসাহিত হয়ে জিগেস্ করলে, "নেমন্তন্ন? —কবে, —কোথায়?"

"মরেছে, পেটুক মরেছে",—শোভা ঘাড় নেড়ে বল্‌লে, "নেমন্তন্ন তোমার নয়,—দয়ার।"

"হ্যাঁ, খালি দয়ার!—দয়ার হলেই আমার।" তার পর রেণুর দিকে মুখ ফিরিয়ে চিরব্রত জিগেস্ করলে, "কবে নেমন্তন্ন, ভাই?"

রেণু হেসে বল্‌লে, "কাল। আমাদের বাগান-বাড়ীতে।"

"তোমাদের বাগান-বাড়ীতে? তবে তো আরো মজা। —কে কে যাবে?"

"সকলেই।"

"রান্নাবান্না কে করবে? ঠাকুর, না নিজেরাই?"

শোভা বল্‌লে, "ঠাকুরও না, নিজেরাও না। রান্না করবে দয়া।"

"তবেই হয়েছে।" চিরব্রত হতাশ হয়ে বসে পড়্‌লো।

রেণু সহাস্যে জিগেস্ করলে, "কি? দয়া রান্না করবে শুনে একেবারে বসে পড়লে যে?"

"অনাহারে থাকতে হবে তাই—;"

দয়া রাগ করে বল্‌লে, "মিছি, মিছি বোকো না। খেতে না পার, ফেলে দিও।"

"তাই দিতে হবে দেখ্‌ছি," ঠোঁট কামড়ে চিরব্রত উত্তর করলে।

* *

তার কথা মিথ্যে করে দেবার জন্যে দয়া খুব মন দিয়ে রান্না করেছিল; সব জিনিষই চমৎকার হয়েছিল। সকলে খুব আনন্দ করে খেলে।

আহার-পর্ব্ব শেষ হতে তিনটে বেজে গেল। খানিক বিশ্রাম করে সুব্রত বল্‌লেন, "চল ডাক্তার, বাগানটা ঘুরে আসা যাক্।"

খানিক দূর এসে ধীরেশ যেন হাঁফাতে লাগলেন।

সুব্রত জিগেস্ করলেন, "খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি?"

"না—। এমন কিছু নয়।"

"আর কাজ নেই, বোস। হাঙ্গরের মত তখন যা খেলে!" সহাস্যে এই কথা বলে ডাক্তারকে নিয়ে সুব্রত একটা বাঁধান বট গাছের তলায় বসলেন, তার পর পাশের বাগানটা দেখিয়ে বল্‌লেন, "অনেক বছর আগে ওখানে আমরা কিছুদিন ছিলুম।"

"কেন?" ডাক্তার জিগেস্ করলেন।

ঐখানেই আমাদের 'মানব-সমিতি'র জন্ম হয়।"

ডাক্তার হেসে বল্‌লেন, "তাই নাকি?"

"হ্যাঁ, ওখানে থাকতে বাহার একবার আমায় বাঁচিয়েছিল।"

ডাক্তার আশ্চর্য্য হয়ে জিগেস্ করলেন, "কি রকম?"

সুব্রত বল্‌লেন, "পুরোনো বাড়ী—জীর্ণ, সাপ খোপের বাসা। এ সব বাড়ীতেই সাপ আছে, চারিদিকে মাঠ কি-না? বাহার তখন ছেলেমানুষ, মাঝে মাঝে ওখানে বেড়াতে যেত। দুপুর

বেলা—একদিন ঘুমুচ্ছি, বালিশের পাশে একটা গোখরো সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে চুপটি করে শুয়ে আছে,—টেরও পাইনি। বাহার হঠাৎ দেখতে পেয়েছিল। চ্যাঁচামেচি কর্‌লে পাছে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়, আর ওঠবার সময় যদি কামড়ে দেয়, তাই, সে খুব আস্তে আস্তে গিয়ে সাপের মুখটা চেপে ধরে ; তার পর আমায় ডেকে তোলে।"

ডাক্তারের মুখ তখন ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে ; জিগেস্ করলেন, "কি করলে তার পর ?"

সুব্রত বল্‌লেন, "ছুরি দিয়ে তাকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেল্‌লুম।"

এবার প্রশংসার বাণীতে ডাক্তার উত্তর দিলেন, "বল কি হে ? অদ্ভুত সাহস তো বাহারের ! কৈ এ কথা তো কারু কাছে এতদিন শুনিনি !"

সুব্রত হেসে উত্তর করলেন, "বল্‌তে আমিই নিষেধ করেছিলুম। ছেলেমানুষ—সকলের প্রশংসা হয় তো হজম করতে পারবে না।" তার পর আকাশের পানে তাকিয়ে বল্‌লেন, "ফিরে চল ডাক্তার, বৃষ্টি আসছে।"

তাঁরা এসে দেখলেন, শোভা দয়াকে গান গাইবার জন্যে ধরেছে। সেও গাইবে না, শোভাও ছাড়বে না। শেষে দয়ারই পরাজয় হোল,—

উষার আলো

"ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে
বাদল বাতাস মাতে মালতীর গন্ধে।
উৎসব সভা মাঝে
শ্রাবণের বীণা বাজে,
শিহরে শ্যামল মাটি প্রাণের আনন্দে।
দুই কূল আকুলিয়া অধীর বিভঙ্গে
নাচন উঠিল জেগে নদীর তরঙ্গে।
কাঁপিছে বনের হিয়া
বরষণে মুখরিয়া,
বিজলী ঝলিয়া উঠে নবঘন মন্দ্রে।"

দয়ার গানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে, মায়া এস্রাজ বাজাচ্ছিল।

বাইরে তখন প্রলয়-নৃত্য সুরু হয়েছে।

মুহুর্মুহু মেঘ গর্জ্জনে পৃথিবীর একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্ত যেন কাঁপছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সমস্ত বাগান ভরে গিয়ে, রাস্তা ঘাট জলে ভেসে গেল। ঝড়ের বেগে সার্সিগুলো ঝন্ ঝন্ করে উঠছে, চ্যুত পুষ্প ও ছিন্ন পত্র বাড়ীময় ছড়িয়ে পড়েছে।

মায়া হঠাৎ এস্রাজ ফেলে দিয়ে, সাপ—সাপ বলে লাফিয়ে উঠলো।

ডাক্তার সভয়ে জিগেস্ করলেন, "কৈ, কোথায় সাপ?"

মায়া ঘরের কোণে একটা এ্যাঁকা ব্যাঁকা সচেতন জিনিষ দেখিয়ে দিলে।

সুব্রত অতি সাবধানে সেটার কাছে গিয়ে বল্‌লে, "তাই তো হে, এ যে মস্ত বড় সাপ।" তার পরই চক্ষের নিমেষে তার ল্যাজ ধরে সকলের মাঝখানে ছুড়ে দিলে। ঘরের ভেতর তখন মহামারি কাণ্ড! পালাতে গিয়ে দোরে ধাক্কা লেগে মায়ার কপাল কেটে ঝুঝিয়ে রক্ত পড়ছে, আঁচলে পা জড়িয়ে দয়া পড়ে গেল, শোভা আর রেণু তারি ওপর লুটোপুটি খাচ্ছে, আর আর ছেলে-মেয়েরা বিলিয়ার্ড টেবিলের ওপর উঠে পড়েছে, ডাক্তার কোন জায়গায় ঠাঁই না পেয়ে ঘরের আর এক কোণে দাঁড়িয়ে সাপটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে চীৎকার করে সুব্রতকে বকছেন, "তুমি তো আচ্ছা গোঁয়ার হে! বাঁশ, লাঠি যা পাও শীগ্‌গীর নিয়ে এস।"

সকলে যে রকম ভয় খেয়েছে, এর পর আর রসিকতা করা চলে না দেখে সুব্রত হেসে বল্‌লেন, "আরে সাপ নয়। দেখই না ছাই কি?"

নীলা তখন বিলিয়ার্ড টেবিলের ওপর থেকে উঁকি মেরে, ভাল করে দেখে বল্‌লে, "ও যে রবারের নল।"

রেণু বল্‌লে, "তাই হবে। বাবার গড়্‌গড়ার নল; ঝড়ে পড়ে গিয়েছে।"

"এই-ই তো যত নষ্টের গুরু"—খুব রাগ করে মায়াকে দয়া ঠেলে দিলে।

মায়া অভিমানের সুরে উত্তর করলে, "বারে, আমি কি করবো? তোমরা ভয় খেলে কেন?" তার পরই মুখটিপে হেসে বললে, "দিদি খুব সাহসী কি-না? তাই—"

"থাম্ থাম্, তোকে আর ফাজ্লামো করতে হবে না। নিজে খুব বীর!"—দয়া বেজায় চটে গিয়েছে।

সুব্রত বললেন, "ডাক্তার, ওরা ঝগড়া করুক, তুমি ততক্ষণ মায়ার কপালে একটা কিছু বেঁধে দাও। রক্তে যে ওর বুক ভেসে গেল।"

রুমাল ভিজিয়ে ডাক্তার তার কপালে বেঁধে দিলেন।

গাড়ীতে ওঠবার সময় সুব্রত বললেন, "ডাক্তার, আজ বাহার নেই, থাকলে দেখতে সাপটাকে কেটে কোপ্তা বানাতো।"

ছেলে-মেয়েদের ভেতর হাসি ফেটে পড়লো। এদের কাছে চুপ করে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ ভেবে ডাক্তার কোনই উত্তর দিলেন না।

* *

কয়েকদিন পরে সুব্রত সকলকে জানালেন, তাঁকে একবার করাচী যেতে হবে, সাত আট মাসের ভেতর হয় তো ফিরতে পারবেন না। এখানকার কাজের ভার তিনি বাহার, আর রেণুর ওপর দিয়ে যেতে চান, ছেলেদের চালাবে বাহার, আর মেয়েদের দেখবে রেণু।

আজ তাঁর যাবার দিন। রেণু বলেছে—সন্ধ্যের পর আসবে, আসবার সময়ও হয়েছে। ছাতের ওপর তার জন্যে তিনি অপেক্ষা করছেন।

সুব্রত মৌন হয়ে বসে। তাঁর ওপরে নীরব শান্ত আকাশ, নীচে কোলাহলময় চঞ্চল পৃথিবী। তিনি বসে বসে ভাবছেন,—এই বিরাট পৃথিবীকে নানা কাল্পনিক বিভাগে খণ্ড খণ্ড করে, বহু মানব-সমাজ নিজ নিজ সীমায় আবদ্ধ হয়ে, পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাবে চিরদিন সভয়ে বাস করছে। যে মানুষ পৃথিবীর যে অংশে জন্মেছে, যেখানের আলো-বাতাসে বর্দ্ধিত হয়েছে,—সেই তার দেশ, তাকে ধন-ধান্যে পূর্ণ করবার জন্যে সে লুণ্ঠন, হত্যা, সবই করে।—কিন্তু উপায় কি? আমার দেশকে আমি কি করে বাঁচাই? আমার কোটী কোটী অসহায় ভাই-বোনকে কি করে রক্ষা করি?

তাঁর চিন্তা-স্রোতে বাধা পড়লো; রেণু আর দয়া এসে সামনে দাঁড়ালো।

সুব্রতর পায়ের কাছে বসে রেণু বললে, "দাদা, যাবার আগে আমাদের কিছু বলুন।"

"নতুন কথা কি আর বল্‌বো, বোন্; যা বলবার সবই তো বলেছি। আমার সেই এক পুরোণো কথা—শিক্ষা দাও, আর সবলের নির্য্যাতন থেকে দুর্ব্বলকে বাঁচাও।"

দয়া জিগেস্ করলে, "তার উপায় কি কেবলই শিক্ষা?"

সুব্রত বল্লেন, "এখন তাই। সমিতির ভাব কে নিয়েছে, দয়া? শিক্ষিত ছেলেরা, আর তোমাদের মত শিক্ষিতা মেয়েরা। কই, চাষাভূষোদের ভেতর আমরা তো এ ভাব এখনও তেমন ছড়াতে পারিনি! কেন পারিনি জান?—তাদের যে মাথা নেই। শিক্ষা তাদের মনের ওপর যুগ যুগ সঞ্চিত মলিনতা ধুয়ে দিয়ে বুদ্ধিকে নির্ম্মল করবে, সেই নির্ম্মল বুদ্ধিতে তারা নিজেদের চিনতে পারবে,—তাদের চৈতন্য হবে।"

রেণু জিগেস্ করলে, "কখন্ বুঝতে পারবো—আমাদের কর্ম্ম-সাধনা সফল হয়েছে?"

"যখন অনুভব করবে—জন্মভূমির একগাছি তৃণের সঙ্গে তোমার নিবিড় সম্বন্ধ, তাকে কেউ দলিত করে চলে গেলে যখন তুমি বুকে ব্যথা পাবে, তখনই—বোন্। এমন নর-নারী চাই—জন্মভূমি ছাড়া যাদের অন্য কোন দেবতা নেই, তাঁর পূজাই যাদের মুক্তি, তাঁর সেবাই যাদের ভক্তি—এমন মানুষ যদি কয়েক হাজার তৈরী করতে পার, রেণু, তবে মাকে আমার—" সহসা সুব্রত থেমে গেলেন, মনের ব্যগ্রতা তিনি যেন মনেই রাখতে চান। তার পর বল্লেন, "এবারে আমায় বিদায় দাও; —যেতে হবে।"

রেণু, আর দয়া সুব্রতকে প্রণাম করলে। দুজনেরই চোখ ছল ছল।

সুব্রত হেসে বল্‌লেন, "তোমরা আছ বলে দুনিয়া বেঁচে আছে, বোন্‌, নইলে এতদিন পুড়ে ছাই হয়ে যেত। মানুষের অন্তরে আগ্নেয়গিরি জ্বলছে, তোমরাই চোখের জলে তাকে শান্ত করে রেখেছ।"

রেণুরা কোনই উত্তর দিল না, কেবলি কাঁদতে লাগলো।

* *

সুব্রত করাচী যাবার কয়েকদিন পরেই চিরব্রত, আর দয়া গেল ডায়মণ্ড-হারবার। একটি ছোট্ট বাড়ী ভাড়া করে তারা সেখানে কিছুদিন থাকবে।

সকালে চা খেয়ে দুজনে বেড়াতে বেরুত। চিরব্রত যেত বাঁধে, দয়া যেত গাঁয়ে। বাঁধের ওপর বসে, নদীর পরপারে আঁখি রেখে, চিরব্রত কত কি ভাবতো। গাঁয়ের ভেতর গিয়ে, মেয়েদের নিয়ে দয়া তাদের সুখদুঃখের কথা শুনতো।

একদিন দয়া বল্‌লে, "আজ তুমি আমার সঙ্গে চল, কাল তোমার সঙ্গে আমি যাব।"

চিরব্রত রাজী হোল।

পথের মাঝে দয়া জিগেস্‌ করলে, "তুমি কি ভাবে সারা জীবন কাটাবে?"

চিরব্রত বল্‌লে, "যেমন কাটাচ্ছি।"

"ঠিক এমনি করে?"

"ঠিক এমনি।"

"আর—আমি যদি সারা জীবন এই চাষাভূষোদের নিয়ে পড়ে থাকি?"

"—আপত্তি নেই।"

সঙ্কুচিত হয়ে দয়া জিগেস্ করলে, "আমার ওপর তোমার কি কোন দাবীও নেই?"

"কিসের দাবী?"

"স্ত্রীর ওপর স্বামীর—।"

চিরব্রত হেসে বল্‌লে, "না, কিছুমাত্র না।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সুব্রতর করাচীতে থাকবার কথা ছিল সাত আট মাস, কিন্তু মাস তিনেক পরেই হঠাৎ 'তার' পেয়ে তাঁকে ফিরে আসতে হোল। তিনি এসে প্রথম উঠলেন শোভাদের বাড়ীতে। দাদকে দেখে সে অবাক হয়ে গেল; তাদের এত বড় বিপদেও তিনি ধীর, স্থির, শান্ত,—পাথরের মত শক্ত। মানুষ একসঙ্গে এত স্নেহময়—এত নির্ম্মম হয় কি করে!

খানিক বিশ্রাম করে সুব্রত, দয়ার কাছে গেলেন। পশ্চিমের জানালা দিয়ে সূর্য্যের শেষ রশ্মি বিছানার ওপর এসে পড়েছে; তিনি দেখ্‌লেন, তারি এক প্রান্তে সে চুপ করে বসে। অরুণ-হৃদয়ে মেঘের আবরণ পড়লে পুষ্প-শষ্প-নদী-নীলাচলা ধরণীর ওপর যেমন বিষাদ-কালিমা বিছিয়ে যায়, নিবিড় শোক-ছায়া দয়ার সর্ব্বাঙ্গে লীলায়িত শ্রী তেমনি ম্লান করে দিয়েছে। মাথায় রুক্ষ দীর্ঘ কেশভার; তার মুখখানি রৌদ্র-ঝলসিত গোলাপের মতই শুকিয়ে গিয়েছে।

পদশব্দে চমকিত হয়ে চোখ ফেরাতেই দেখলে—দাদা; দয়া উঠে এসে তাঁকে চেয়ার দিয়ে, নিজে তাঁর পায়ের কাছে বসলো। ঝর্ ঝর্ করে জল পড়ে তার দুটি গাল ভাসিয়ে দিচ্ছে।

সুব্রত বললেন, "কেঁদ না দয়া, কেঁদ না।"

তাঁর সান্ত্বনা-বাক্যে দয়ার রুদ্ধ শোক উথলে উঠলো; কিছুতেই সে নিজেকে সংযত করতে পারলে না।

প্রাণহীন পুতুলের মত সুব্রত বসে; বাইরে কোন প্রকাশ নেই,—চঞ্চলতা দুঃখ শোক কিছুমাত্র নেই, কিন্তু ভেতর তাঁর পুড়ে যাচ্ছিল। তিনি কেবলি ভাবছিলেন,—এমন করে রেণুর মরবার কি প্রয়োজন ছিল? সকলের মত সেও তো হেসে খেলে বাঁচতে পারতো, তবে কেন সে গৃহের মমতা ছিন্ন করে মরণকে উন্মাদের মত বরণ করলে?

—দেহের অন্তরালে যে-মন নিয়ে সে এসেছিল, তাই তাকে সকলের মত বাঁচতে দেয়নি। যে নর-নারীর ভেতর রেণু জন্ম নিয়েছিল তাদিকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও অতিপ্রিয় আত্মীয় হতে সে পৃথক করেনি; তাদের দারিদ্র্য ও লঞ্ছনা চিরদিন সে আপনার বলেই অনুভব করেছে।

—তার হৃদয় ছিল অপরাজেয়, মন ছিল মমতাময়, বুদ্ধি ছিল ক্ষুরধার, প্রাণ ছিল অসীম—উদার। কতদিন সে কেঁদেছে, অসহায়া নারীকে দেখে কেঁদেছে, রুগ্ন পাণ্ডুরবর্ণ শিশুকে দেখে কেঁদেছে, আবার যাবার বেলায় সে কেঁদে কেঁদেই তাঁর কাছে বিদায় নিয়েছে।

সুব্রতর অন্তঃকরণ অব্যক্ত বেদনায় গুমরে মরছিল। বেদনা—

শোকে নয়, তাঁর আশা মিটলো না বলে। তিনি ভেবেছিলেন,— দুর্ব্বলের কণ্ঠনালী ছিঁড়ে যারা শোণিতধারা পান করছে, তারা ধ্বংস হবে—সে শুধু রেণুর তপস্যার আগুনে। যে-অনল সে জ্বেলেছে তা কি নিভে যাবে? তারি প্রজ্জ্বলিত হোমানলে সে যে নিজের নিষ্পাপ দেহ-মন আহুতি দিলে, তার ক্ষুধা কি তাকে পেয়েই তৃপ্ত হবে?

—না, না।

সুব্রত যেন চোখের সামনেই দেখতে পেলেন—মায়ের কপালে দাবাগ্নি জ্বলছে, মহাদেবের পিঙ্গল জটার মত তারি অগ্নি-শিখায় কত রেণু খেলাচ্ছলে নিজেদের আহুতি দিচ্ছে।

* *

কত কথা, কত ঘটনাই না আজ দয়ার মনে পড়ছে। প্রাণাধিক প্রিয় বন্ধুর ভালবাসা ও তিরস্কার—উভয়ের স্মৃতিই সম ভাবে, সম আকর্ষণে এ রাজ্যের পরপার হতে কি বিপুল টানেই না তাকে টানছে!

* *

সুব্রত বল্লেন, "দয়া, তার সব কথা আমায় বল।"

"খবরের কাগজে বেহারে প্লেগের কথা পড়ে সে বায়না ধরলে, 'আমি যাব, আহা! কত লোক কত যন্ত্রণা পেয়ে মরছে, আমি গিয়ে তাদের সেবা করবো, না পারি—

শুধু কাছে বসে থাকবো।’—আমি তাকে নিষেধ করিনি; শুধু বল্‌লুম—‘তুই গেলে আমিও যাব, মরতে হয় এক সঙ্গেই মরবো, তোকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না’।” দয়া ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। খানিকক্ষণ সে কোন কথাই বলতে পারলে না, তার পর একটু সামলে নিলে; “মায়া আর নীলাও আমাদের সঙ্গে গেল। সেখানে গিয়ে কিছুদিন বেশ ছিলুম। রেণু দিন রাত খাটতো। রাত্তিরে ঘুমতো না, দিনেও বিশ্রাম করতো না; সে যেন মরণ-উৎসবে মেতে গিয়েছিল। এ সব তো আপনাকে লিখেছিলুম।”

সুব্রত ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন।

“তার পর একদিন তার হঠাৎ জ্বর আর গলায় ব্যথা। বুঝলুম, সর্ব্বনাশ হয়েছে। অসুখের সংবাদ চারিদিকে আগুনের মত ছড়িয়ে পড়লো, ছেলে-মেয়ে যে যেখানে ছিল ছুটে এল; তারা যেন সেদিন মরণের ভয়ও ভুলে গিয়েছিল। কতবার তাদের বল্‌লুম,—তোমরা বাড়ী যাও। তারা বল্‌লে,—আমাদের রেণুদিকে ছেড়ে আমরা যাব না। সেখানে সকলে তাকে ঐ বলে ডাকতো।

“দাদা, সে বড় কষ্ট পেয়েছিল। যন্ত্রণা সময় সময় অসহ্য হয়ে উঠ্‌তো; আর—কেবলি আপনার নাম করছিল।”

“আর কোন কথা বলেনি?” সুব্রত জিগেস্ করলেন।

"হ্যাঁ, বলেছিল। যাবার কিছুক্ষণ আগে 'রাণী' আমার হাতখানি তার বুকের ওপর রেখে বল্‌লে, 'আমি কি ভীরুর মত কেঁদে কেঁদে মরবো? দেখিস্‌ দয়া, কেমন বীরের মত বুক ফুলিয়ে যাব।' একটুখানি সে হাসলে; তার পর আমায় কোলের কাছে টেনে নিয়ে বল্‌লে, 'কিন্তু ভাই, আবার আসবো। ভাই-বোনেরা আমার, এখানে হাহাকার করে মরবে, আমি তাদের ছেড়ে কি থাকতে পারি?—না দয়া, তা পারবো না। আমিও তাদের সঙ্গে মরবো—শতবার, শত সহস্রবার'।"

সুব্রতর চোখের দুটি কোণে দু ফোঁটা জল———

শেষ